নজরুলের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্যে লেখা গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

আছমা আলম
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং-৫১৬, শিক্ষাবর্ষ '৯৫-'৯৬
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
400653

400653

জুন ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধীনে আছমা আলম এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য লিখিত ও পরীক্ষার জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ 'নজরুলের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা' অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রকার ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

(ড. রফিকুল ইসলাম)
নজরুল অধ্যাপক
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

মুখবন্ধ
নজরুলের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা ০৫

প্রথম অধ্যায়
নজরুল কাব্যে দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়
নজরুল কাব্যে ঘ্রাণনির্ভর বাক্‌প্রতিমা ২২

তৃতীয় অধ্যায়
নজরুল কাব্যে শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা ২৮

চতুর্থ অধ্যায়
নজরুল কাব্যে স্বাদনির্ভর বাক্‌প্রতিমা ৩৭

পঞ্চম অধ্যায়
নজরুল কাব্যে ত্বক বা স্পর্শনির্ভর বাক্‌প্রতিমা ৪২

ষষ্ঠ অধ্যায়
নজরুল কাব্যে মিশ্র বাক্‌প্রতিমা ৫০

উপসংহার ৫৫

গ্রন্থপঞ্জি ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের কবিতায় বাক্‌প্রতিমা

বাক্‌প্রতিমা (image) নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

"It (Poetry) is the supreme form of emotive Language." রিচার্ডস্ এর এই উক্তি থেকে বলা যায় কবিতার শব্দবিন্যাসে প্রতিবিম্বিত হয় পৃথিবীর আলো-বাতাস; মেঘ-রৌদ্র ছায়াময় সৌন্দর্যের মতোই ব্যক্তির কল্পনা-প্রতিভার রূপ-রস-শব্দ-ঘ্রাণ স্পর্শের ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধির পরিচর্যায়। শব্দে শব্দে কবিতার জন্ম, সেখানে রয়েছে বৈচিত্র্যের প্রকাশ সঙ্গীত, চিত্র অনুভবচেতনা ইত্যাদি। এই শব্দ দু'শ্রেণীর হতে পারে আভিধানিক ও ভাবগত। আভিধানিক অর্থ শব্দের পরিসরকে সীমাবদ্ধ করে। অপরদিকে ভাবগত অর্থে কবির মানসপ্রতিভার উজ্জ্বলতায় শব্দ যাত্রা করে অসীমের সন্ধানে। একটি শব্দই সেখানে কবিচেতনার মৌল-সঙ্কেত একটি শব্দেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে কবির কল্পনা প্রতিভার চিত্রধর্মের ব্যঞ্জনা। শব্দের এই অর্থ, সঙ্গীত, চিত্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ আবেগের প্রকাশ সমন্বয়ে কবিতায় কবি সৃষ্টি করেন অসাধারণ শিল্প, নির্মাণ করেন চেতনার সৌধ। শব্দ বিন্যাসের এই কৌশলকে চিত্রকল্প বা ইমেজ বলা যায়। চিত্রকল্পের সমস্ত এলাকা জুড়ে তাই ছড়িয়ে থাকে কবিচেতনার উপলব্ধি অনুভবের শব্দরূপ; চিত্রকল্পের মধ্যে তাই প্রকাশিত হয় পৃথিবীর রূপ-রঙ-রেখা স্পর্শের মায়াবি আবেগ। সুতরাং সহজ কথায় শব্দের মাধ্যমে কবিচেতনার ভাব এবং উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশই চিত্রকল্প বা বাক্‌প্রতিমা।

ইংরেজি Image শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় 'চিত্রকল্প' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বুদ্ধদেব বসু উল্লেখ করেছেন শব্দটির উদ্ভাবক কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু আবু সায়ীদ আইয়ুব এ তথ্যের প্রতিবাদ করে জানিয়েছেন—imagery-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'চিত্রকল্প' শব্দটি তিনি প্রথম ব্যবহার করেন। 'ইমেজ' এই পারিভাষিক শব্দটি নিয়ে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। অনেক সমালোচক এক 'মেটাফর'-এর সমগোত্রীয় অনুরূপতাজ্ঞাপক অলংকার হিসেবে গণ্য করেন। আবার মনস্তাত্ত্বিকদের নিকট এটি কবির ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা রূপ-রস-ঘ্রাণ-স্পর্শ-রঙ-রেখায় ইন্দ্রিয়সমূহের শিল্পিত ব্যবহারে প্রকাশিত হয়। এই অর্থে 'ইমেজকে' বলা যায় কবিচেতনার সংবেদনময়তার দর্পণ।

Image-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'চিত্রকল্প' ছাড়াও ড. অমলেন্দু বসু 'বাক্‌প্রতিমা', ড. সুশীলকুমার গুপ্ত 'ভাবরূপচিত্র' এবং সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'মানস প্রতিবিম্ব' শব্দের উল্লেখ করেছেন। আবার 'বাণীশিল্প', 'রূপকল্প', 'শব্দমালা' হিসেবেও এর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু Image বা Image এর বাংলা প্রতিশব্দগুলি নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ড. অমলেন্দু বসুর মতে 'চিত্রকল্প' শব্দটি কেবল একধরনের ইমেজকেই ইঙ্গিত করে, যা দৃষ্টিলাভের কল্পনাশক্তি (visual Imagination) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে কাব্যের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশরূপটি কেবল চিত্রধর্মী বলে মনে করা হয়েছে। অথচ কবির কল্পনা প্রতিভার উৎস যে ভাষা, যে বাক্‌রীতি সেখানে দৃশ্যানুভূতির সঙ্গে শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ-স্বাদ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জানুভূতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ড. বসুর ব্যবহৃত 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটিতে ভাস্কর্যধর্মী স্থাপত্যরীতির কঠিন অবয়ব দৃষ্টিগোচর হয়। সেক্ষেত্রে 'চিত্র' শব্দের মধ্যে রঙ-রেখার মাধ্যমে একটি সম্প্রসারিত ব্যঞ্জনা খুঁজে পাওয়া যায়। 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটিতে ইমেজ এর ইন্দ্রিয়বেদ্যতা বৈশিষ্ট্যের কোন দ্যোতনাই পাওয়া যাচ্ছে না। এদিক থেকে বরঞ্চ 'চিত্রকল্প' শব্দটির মধ্যে ইন্দ্রিয় সংবেদনার ইঙ্গিত বেশ স্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে। 'চিত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিক থেকে লক্ষ্য করা যাক—সংস্কৃত অভিধান বলছে—চিত্র = চিৎ - ত্রৈ + অল্ - চিত্র অর্থে যা চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করে। আর 'কল্প' অর্থে 'তৎতুল্য'—তার তুল্য যা তাই চিত্রকল্প। আবার 'কল্প' শব্দটি ব্যুৎপত্তিতে পাচ্ছি কল্প কল্প—to create, সৃষ্টি করা, মূলত মনোলোকে ভাবনার সাহায্যে যা সৃষ্টি করা হয়, তার ক্রিয়াটির নাম কল্প। সুতরাং শব্দ তাৎপর্যে 'চিত্রকল্প' কাব্যকারুকলার অনেক বেশি বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনা করছে।"[৪]

Dhaka University Institutional Repository

ড. কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রকাব্যে রূপকথা' গ্রন্থে Image শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'রূপকল্প' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, রূপ শব্দটির মধ্যে রয়েছে সমগ্রতা ও অখণ্ডতা। যদিও শ্যামলকুমার ঘোষ "কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ" গ্রন্থে বলেছেন, 'কল্পনা' শব্দের খণ্ডাংশ হিসেবে কল্প গ্রহণযোগ্য নয়। তাই রূপকল্প এর পরিবর্তে তিনি 'রূপকল্পনা' বলতে আগ্রহী।

Image শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে এই আলোচনার প্রান্তে বলা যায়—'চিত্রকল্প', 'বাক্‌প্রতিমা', 'রূপকল্প'—প্রতিটি শব্দই মূলত কবিচেতনায় আবেগ ও কল্পনার একটি বিশেষ শাব্দিক প্রকাশ যা দ্বারা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে কবিতার শরীরে বৈচিত্র্যময় চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায়। ইন্দ্রিয়াতীত বিমূর্ত আবেগগুলিকে মূর্ত বা দৃশ্যময় করে তোলা যায় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে চিত্রকল্প দিয়ে। নজরুলের কবিতায় বাক্‌প্রতিমার গুরুত্ব আমার আলোচ্য বিষয়। নজরুলের কবিতার বৈচিত্র্যধর্ম; পৌরাণিক চরিত্রপুঞ্জের সমন্বয়ে ভাস্কর্যরীতির নিবিড় ব্যবহার; পৌরুষদীপ্ত শক্তিমত্তার প্রয়োগ—ইত্যাদি বিবেচনা করে বাক্‌প্রতিমা শব্দটি গ্রহণ করেছি।

চিত্রকল্প কি কবিতার স্বতন্ত্র কোন অলঙ্কার? তা নয়, অথচ অনেক অলঙ্কারের সমন্বয়ে চিত্রকল্পের প্রকাশ। যেহেতু কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র, সজ্জিত এবং পরোক্ষ, চিত্রকল্পের প্রবেশ তাই অনিবার্য।[৫] কিন্তু কিভাবে এই চিত্রকল্পের নির্মাণ? জীবনানন্দ দাশ যেমন বলেছিলেন, 'উপমাত্বেই কবিত্ব'—প্রকৃতপক্ষে চিত্রকল্প ব্যাপক অর্থে উপমারই[৬] সম্প্রসারিত রূপ। কিন্তু উপমা বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন, আর চিত্রকল্প বস্তুর হৃদয়ালোকে প্রবেশ করে চিত্রময়তাকে করে তোলে সজীব ও জীবন্ত। বস্তু ও চিত্রময়তার অতিক্রম করেই কল্পনা এবং কল্পনায় অন্তর্গত কবির আবেগ উপলব্ধি অভিজ্ঞতার সারাংশই—চিত্রকল্প। একটি সার্থক চিত্রকল্পের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

ক. অবয়ত্বসূত্র বা Principle of word-picture;

খ. রূপকতত্ত্ব বা Principle of figurativeness or Principle of Metaphor;

গ. ইন্দ্রিয়বেদ্যতা তত্ত্ব বা Principle of sense-stimuli;

ঘ. সাদৃশ্যধর্মিতা তত্ত্ব বা Principle of comparison.[৭]

কবিতা যেহেতু বাস্তবের নির্বিবাদী অনুকৃতি নয় তাই 'কবি ত্রিবিধ গুণধর্ম'—অপূর্বতা, প্রগাঢ়তা এবং আবেগ কল্পনা সঞ্চার করে 'বাক্‌চিত্র'কে রূপান্তরিত করেন চিত্রকল্পে।[৮] এই গুণধর্ম কবির চেতনালোকে দু'ভাবে কাজ করে—ক. বস্তু অতিক্রমী ভাবের প্রসারণে এবং খ. ইন্দ্রিয়জ আবেগের আবেদনে; অর্থাৎ দেহী ও দেহোত্তীর্ণ—উভয় কল্পনা সঞ্চারী গুণই চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত। প্রতিটি চিত্রকল্পের শরীরে থাকবে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য—

ক. প্রাণময়তা (Freshness).

খ. আত্যন্তিকতার বেগ (intensity)

গ. উদ্দীপন শৈলী (evocativeness or illumination).[৯]

চিত্রকল্প অনেক সময় একটি উপমা, রূপক, প্রতীক, সমাসোক্তি অথবা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে এমনভাবে নির্মিত হয় যে, তা এক নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে—এই প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রাণময়তা বা freshness. উপমানচিত্রের শরীরে চমৎকারিত্ব ও মাধুর্যগুণ আরোপিত হলে তখন চিত্রকল্পে এসে যায় আত্যন্তিকতার বেগ বা interrity. উপমেয়-উপমানের বিপ্রতীপ চারিত্রের মাঝে কল্পনার আলোকসম্পাত করে অভিনব সাদৃশ্যসৃষ্টির মাধ্যমে কবি যখন কোন বস্তু বা বিষয়ের রূপান্তর সাধন করেন তখন কল্পনায় উদ্দীপনায় ব্যক্তিহৃদয়ে সৃষ্টি হয় নতুন ব্যঞ্জনা। কল্পনা বা বস্তুর প্রকৃতিগত পরিবর্তনের বিচারে চিত্রকল্পকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়—

ক. সাধারণ চিত্রকল্প

Dhaka University Institutional Repository

খ. রূপকধর্মী চিত্রকল্প
গ. প্রতীকধর্মী চিত্রকল্প

কল্পনা বা বস্তুর চেতনাগত গুরুত্ব ও প্রাধান্য সাধারণ চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য। কবির অন্তরাবেগের ছোঁয়ায় সাধারণ দৃশ্যচিত্র-এ জাতীয় চিত্রকল্পে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ কবিচেতনায় আবেগধর্ম সাধারণ চিত্রকল্পের শরীরে প্রাণসঞ্চার করে।

রূপকাত্মক চিত্রকল্পে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি ও কল্পনায় আন্দোলন লক্ষণীয়। রূপকের মতোই রূপকধর্মী চিত্রকল্পে এখানে কবিচেতনার ভাব ও কল্পনা একত্রিত হয়ে বস্তুর রূপ অতিক্রান্ত রূপান্তরের নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে। প্রতীকধর্মী চিত্রকল্পে ব্যক্তির আবেগ উপলব্ধি অনুভবচেতনা পঞ্চইন্দ্রিয়ের সংবেদনায় কবিচেতনার সৃষ্টিশীলতার স্পর্শে রূপলাভ করে অসাধারণ শিল্পে। প্রতীকী চিত্রকল্পের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতিচ্ছবিই আভাসিত হয়। চিত্রকল্পের এই স্তরে ভাষার আবেগময় গুণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় মননদ্যোতক গুণ।[১০] এ কারণে সাধারণ এবং রূপকীচিত্রকল্পগুলি ইন্দ্রিয়জ সীমানায় আবদ্ধ অর্থাৎ দেহী, অপরপক্ষে প্রতীকধর্মী চিত্রকল্পে ঐ সমস্ত চিত্রসমূহ রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ দেহোত্তীর্ণ ব্যঞ্জনায়।

উপর্যুক্ত ত্রয়ী চিত্রকল্প ছাড়াও আরও একশ্রেণীর চিত্রকল্প লক্ষণীয়। এটি হল মালাচিত্রকল্প (chain-imagery)। এ ধরনের চিত্রকল্পে একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক চিত্রকল্পের মাধ্যমে একাধিক ইন্দ্রিয় সংবেদনার সমন্বয় সাধন করা হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথের 'খোয়াই' কবিতার একটি চিত্রকল্প—

পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়
তারি একধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক্ষয়ে
দেখা দিয়েছে
উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়;
মাঝে-মাঝে মরচে ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।
(খোয়াই, পুনশ্চ)

এখানে তৃণ আচ্ছাদিত প্রান্তর যেন পৃথিবীর উত্তরীয়, যার একটি প্রান্ত ছিঁড়ে গেছে এবং তারই ফাঁকে দেখা দিয়েছে কাঁকরের রক্ত-আভা। কবির চোখে এই কাঁকরের লাল সমুদ্র শব্দহীন আন্দোলনে তরঙ্গায়িত। তোলপাড় শব্দটি চিত্রকল্পে সংযুক্ত করে নতুন মাত্রা। এরই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে দুর্গার হাতে পরাজিত কৃষ্ণবর্ণ মহিষাসুরের ছিন্ন মস্তক যেন সবুজ ও লালের মধ্যবর্তী কালো মাটি। উপর্যুক্ত কবিতাংশে চিত্রকল্পের শৃঙ্খল নির্মাণ সৃষ্টি করে নতুন আবেগের মাত্রা।

চিত্রকল্প কবিতার মূল চেতনাকে প্রকাশ করে। তাই কাব্য চেতনার সঙ্গে চিত্রকল্পের সংযোগ ঘনিষ্ঠ। চিত্রকল্প আসলে কল্পনারই সন্তান, স্বপ্নকে শরীরী করে তোলা তার কাজ, স্বপ্নকল্পনাকে মানবিক ইন্দ্রিয়ের সন্নিধানে আণয়ন। কোন ইন্দ্রিয়? চোখ, নাক, কান, রসনা ও ত্বক; এবং তা থেকে এই সব ইন্দ্রিয়ানুভূতির উদ্বোধন : দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রুতি স্বাদ ও স্পর্শ। অবশ্য একথা বলাবাহুল্য : এই ইন্দ্রিয়ের সাহিত্যিক প্রয়োগ ও এদের শারীরিক ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য বিপুল। সংক্ষেপে ছবিটি এরকম :

চোখ	-	দৃষ্টি	-	চিত্রকল্প
নাক	-	ঘ্রাণ	-	চিত্রকল্প
কান	-	শ্রুতি	-	চিত্রকল্প
রসনা	-	স্বাদ	-	চিত্রকল্প
ত্বক	-	স্পর্শ	-	চিত্রকল্প[১১]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত বর্ণনা, শ্রেণীকরণ ও ছকের মাধ্যমে একথা বলা যায় যে, চিত্রকল্প মূলত ইন্দ্রিয়নির্ভর। তবে একথা সত্য, চিত্রকল্প কেবল ইন্দ্রিয়জ নয়, ব্যক্তির অনুভূতি ও উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশও বটে।

চিত্রকল্পের এই ক্ষুদ্র আলোচনা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে আমরা বিবেচনা করব, কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) কবিতায় চিত্রকল্পের গতিপ্রকৃতি, চারিত্র্যধর্ম ও তঁর সৃষ্টিশীলতার স্বরূপ কেমন ও স্বাতন্ত্র্য কোথায়। প্রকৃত অর্থে রবীন্দ্র পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম মৌলিক কবি। বিষয় নির্বাচন এবং কবিতার ভাষা ও শরীর নির্মাণে তাঁর এই মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতায় অপরিমেয় শক্তিমত্ততার আহ্বান, প্রকৃতি প্রেমের অসামান্য উদ্বোধন সবকিছুর উর্ধ্বে বৈচিত্রের প্রতিমাত্রা, তাঁর কবিতাসমূহের এই স্রোতশীল প্রবাহে গতিময়তা এনেছে মূলত তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্পের আশ্চর্য সংযোজন; যদিও চিত্রকল্প সৃষ্টি তাঁর কাব্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য নয়। নজরুল ছিলেন সমাজ সচেতন কবি। সমাজ সচেতনতা অর্থাৎ সমকালীন প্রসঙ্গনির্ভর কবিতাগুলিতে নজরুল ইসলাম সন্ধান করেছেন অপরিমেয় শক্তিমত্ততা, আহ্বান করেছেন পৌরাণিক ঐতিহাসিক চরিত্রসমূহকে; উপলব্ধি করেছেন ঝড়ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে; যুদ্ধের তাণ্ডবতায় অপশক্তি বিনষ্ট হয়ে সুন্দর সমাজের। তাই তাঁর কবিতার সার্থকতার এই প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছে চিত্রকল্প। কেবল সমাজ সচেতনতা বিষয়ক কবিতাবলিই নয়, প্রকৃতি ও প্রেম বিষয়ক কবিতাবলির মধ্যেও নজরুল ইসলাম চিত্রকল্প সংযোজন করেছেন আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত স্নিগ্ধতায়।

নজরুল কাব্যে বাক্‌প্রতিমা তথা চিত্রকল্প সৃষ্টির আলোচনার সূচনায় চিত্রকল্পের ইন্দ্রিয় নির্ভরতার প্রসঙ্গে বলেছি। প্রকৃতপক্ষে চিত্রকল্প ইন্দ্রিয়নির্ভর। নজরুল ইসলামের কবিতায় বিবিধ ইন্দ্রিয়ের বিপুল ব্যবহার লক্ষণীয়। দৃশ্য-ঘ্রাণ-শ্রুতি স্পর্শানুভূতির পৃথক-পৃথক চিত্রকল্প যেমন তাঁর কাব্যে অজস্র তেমনি এসব ইন্দ্রিয়নির্ভরতায় মিশ্র অনুভূতির ব্যবহার তাঁর কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কবিতায় প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগে চিত্রকল্প নজরুলের সার্থকতা পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বিচিত্র প্রবন্ধ*।
"কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়ে দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটা দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে।
চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ, একথা মানা চলিবে না। চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয়, তবে সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া উঠে।"

২. বুদ্ধদেব বসু : *সমালোচনার পরিভাষা*, কবিতা, ১৪/১, আশ্বিন ১৩৫৫, পৃ.-৫৩।

৩. আবু সায়ীদ আইয়ুব : *পথের শেষ কোথায়*, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০, কলকাতা, পৃ.-২১।

৪. ড. শ্যামল কুমার ঘোষ : *কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ.-৪।

৫. সিদ্দিকা মাহমুদা : *রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প*, মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, পৃ.-৯।

৬. বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে জীবনানন্দের এ উক্তি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু কোথায় জীবনানন্দ এ উক্তি করেছেন তা খুঁজে পাওয়া যায়নি বলে আবদুল মান্নান সৈয়দ জানিয়েছেন।

৭. ড. শ্যামল কুমার ঘোষ : *কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, পূর্বোক্ত পৃ.-৯।

৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ : নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩, পৃ.-৩৪।

৯. Ceiel Day Lewis : *The Poetic Image*, ibid, P.-24.

১০. বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য ড. শ্যামল কুমার ঘোষ : *কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, পূর্বোক্ত পৃ.-৩৩।

১১. আবদুল মান্নান সৈয়দ : *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা*, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৭৭, পৃ.-২৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা

বস্তু দর্শনের ফলে ব্যক্তির মধ্যে সূচিত হয় নব-নব চেতনা। আর যে কোন শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর আবেগ ও চেতনা প্রধানতম উৎস। সুতরাং দৃশ্যইন্দ্রিয় শিল্প সৃষ্টিতে এক অনিবার্য মাধ্যম। কবিতার শরীরে সংগ্রথিত চিত্রময়তা বা বাক্‌প্রতিমা তাই প্রধানত দৃষ্টিনির্ভর। নজরুল ইসলামের কাব্যচর্চার সূচনাকাল থেকেই লক্ষণীয়, তিনি ইন্দ্রিয় নির্ভর কবি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রচেষ্টার প্রথম পর্যায়ে সুরদাসের মুখচ্ছেদে শরীরী চোখ উৎপাটন করে হৃদয়মানসে ফোটাতে চেয়েছে তৃতীয় নয়ন। অপরপক্ষে নজরুল ইসলাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে ইংরেজ শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত ভারতীয় সমাজে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় আবার ব্যক্তিবোধের অহংচেতনায় তাঁর চেতনাকে জাগ্রত করেছেন। কেবল বিদ্রোহের বাণীমূর্তি নয়, দ্রোহ-ক্ষোভ-প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও এ সকল মনোবাসনা অপূর্ণ থাকায় নজরুল তাঁর বিদ্রোহের অনুভূতি প্রকাশে সাহায্য গ্রহণ করেছেন পৌরাণিক এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপকরণের। ভারতীয় পুরাণ, বাংলার লোকজ পুরাণ, ইউরোপীয় ও মধ্যপ্রাচীয় মিথ এবং ইসলামী ঐতিহ্যের বিচিত্র রূপ নজরুলের কাব্য সৃষ্টিতে এক অনিবার্য উৎস। এসব পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রাবলী কবি চেতনার আবেগে-অনুভবে-বিদ্রোহে ধ্বংস ও সৃষ্টির যুগল অনুষঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে চিত্রকল্পে। বিশেষত ভারতীয় পুরাণ ব্যবহারে শিব, অর্জুন, দুর্বাসা, ভীম, বিশ্বমিত্র, বিষ্ণু, পরশুরাম, বলরাম ভৃগু, চণ্ডী, দ্রৌপদী প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র একটি ভাস্কর্যধর্মীতা দৃশ্যময় করে তোলে। প্রথমাবধি নজরুলের কবিতা তাই প্রধানত দৃষ্টিনির্ভর।

প্রথম পর্যায়ের কবিতায়[১] "নজরুল ইসলাম নিজস্ব অনুভবে, বোধে এবং বিবেচনায় সর্বোপরি তাঁর সৃজনশীল শক্তিধানের প্রতিরূপ সন্ধানে শিবের বিবিধ রূপ ও রূপান্তরকে করেছেন চিত্র ও চিত্রকল্পময়।"[২] যেমন—

ক. মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ,...
(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

খ. আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় সকাল-বৈশাখীর
(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

গ. আমি পিনাক পানির ডমরু ত্রিশূল...
(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

ঘ. মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিণয়ন ঘন ঘোলাটে।
(ধূমকেতু, অগ্নিবীণা)

এ সকল উদ্ধৃতির প্রত্যেকটিই এক একটি দৃশ্যকে উপস্থাপন করে। প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি মিলের কাহিনী চিত্র ও চরিত্রের ভাস্কর্যধর্মী উপস্থাপনায় নজরুল সৃষ্টি করেছেন অসম্ভব শক্তির আধার। 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রচণ্ড গতিময়তা, সামাজিক অনাচার-অবিচার-পরাধীনতা ভেঙ্গে শোষণমুক্ত নতুন সমাজ গঠনের কামনায় নজরুলের পৌরাণিক চরিত্রের অমিত তেজ ও শক্তিমত্তার সন্ধান।

'প্রলয়োল্লাস' কবিতাতেও শিবের নটরাজ মূর্তি দৃশ্যইন্দ্রিয়কে প্রসারিত করে। শিবের নটরাজ এবং তার বিচিত্র রূপ কবিমানসের পরিচয়বাহী—

১. আসছে এবার অনাগত প্রলয় নেশার নৃত্য পাগল,
সিন্ধুপারের সিংহ দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

Dhaka University Institutional Repository

২. ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপ্‌টা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালামুখী ধূমকেতু তার চামর দুলায়।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

৩. দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার এস্ত জটায়।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছের প্রথমটিতে 'নৃত্য-পাগল' দৃশ্যময়তার মাধ্যমে শিবের ধ্বংসাত্মক মানসিকতার নৃত্যরত নটরাজ-মূর্তি কবিকল্পনার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে সার্থক বাক্‌প্রতিমায়। দ্বিতীয় উদ্ধৃটিতে 'নটরাজ' পরিণত হয়েছে কেশের জটাধারী ধূর্জটিতে—ঘনায়মান কালবৈশাখীর ঘনমেঘ ধূর্জটির আকাশ জোড়া জটার রূপে দৃশ্যমান। তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে 'এস্ত জটা' ও পিঙ্গল রঙের বর্ণময়তা ঘনায়মান প্রলয়কে আরো ভয়ঙ্কর রূপ দান করেছে। লক্ষণীয় শিবের পৌরাণিক চরিত্রকে নজরুল তাঁর কবিচেতনার আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহে-প্রতিবাদে বিপ্লবের সাহসী মন্ত্রে নির্মাণ করেছেন। প্রতিটি উদ্ধৃতিই এক একটি চলন্ত চিত্রের রূপে দৃশ্যময়।

ভারতীয় পৌরাণিক বিষয় এবং পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে নজরুল চিত্রকল্প রচনায় সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের সংখ্যাই অধিক। যেমন—

১. দুষমন লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল্‌-মিল্‌
(শত্‌-ইল-আরব, অগ্নিবীণা)

২. নাচে পাপ সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ।
(খেয়াপারের তরণী, অগ্নিবীণা)

৩. আয় ভাই তোর বৌ এলো ঐ সন্ধ্যা মেয়ে রক্ত চেলী পরে
আঁধার শাড়ী পরবে এখন পশবে সে তোর গোরের বাসর ঘরে।
(কামালপাশা, অগ্নিবীণা)

উদ্ধৃতি চিত্রকল্পত্রয় দৃশ্যরূপময়, প্রথম চিত্রকল্পে শত্রুর রক্তকে শত্‌-ইল্‌-আরব নদীর তরঙ্গের ঝিল্‌মিল্‌ চিত্রের মধ্যে কবি দেখেছেন। চিত্রকল্পটিতে কবি উপমানের মধ্যে দৃষ্টিনির্ভর অপূর্ব উপলব্ধির চেতনা সঞ্চার করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়টিতে কেয়ামত রাত্রির ভয়াবহতা দৃষ্টিগোচর করতে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ এবং নটরাজ শিবের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে সাদৃশ্য নির্মাণ করেছেন। শেষ উদ্ধৃতিতে সন্ধ্যার রক্ত রঙের আকাশ আর জমাট বাঁধা রক্তের কালো কলিজার টুকরো থেকে কবির চেতনা প্রসারিত হয়েছে কবরের গভীর অন্ধকারে। দৃশ্যময়তার সঙ্গে কবি কল্পনার সংমিশ্রণে চিত্রকল্পটি একটি নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে "খেয়াপারের তরনী" কবিতায় কেয়ামত রাত্রির ভয়াবহতাকে দৃশ্যময় করার জন্য দৃশ্যরূপময় বা চিত্রধর্মী চিত্রকল্পের ব্যবহার অনির্বাণ হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে ধ্বনির গম্ভীর নির্দোষ অনুপ্রাসের সাহায্যে, এ চিত্রকল্প পরিচিত জীবন থেকে আহরিত। বর্ষার ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ প্রমত্তা নদীর ভয়াল রূপ নদীমাতৃক বাঙালি জীবনে অত্যন্ত পরিচিত, কেয়ামত রাত্রির বর্ণনায় সে পরিচিত দৃশ্যকে ব্যবহার করে কবি ত্রাস ও শঙ্কাহত পাপীদের অসহায় অবস্থাটিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে দৃশ্যমান করে তুলেছেন। "খেয়াপারের তরণী" কবিতার চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্তবকে পুণ্যবানদের খেয়াপারের দৃশ্য বর্ণনায় কবি যে

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন, তাও জীবন থেকে নেয়া[৩] :

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
দাঁড়ি মুখে সারি গান লা-শরীক আল্লাহ্।
(খেয়াপারের তরণী, অগ্নিবীণা)

চিত্রকল্পটি বাংলায় নদ-নদীতে ভাসমান নৌকা ও মাঝি-মাল্লাদের চির পরিচিত দৃশ্য থেকে সংগৃহীত, দাঁড়ি মুখে মাঝি-মাল্লাদের সারিগান গেয়ে দাঁড় বেয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমাদের পরিচিত। অভিনবত্ব এসেছে "লা-শরীক আল্লাহ"—এই আরবি বাক্যাংশের সংযোজনে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টিতে। আলোচ্য কবিতাটির ষষ্ঠ স্তবকে পাই বিচিত্র ঐতিহ্য থেকে আহরিত এক অভিনব চিত্রকল্প[৪] :

শাফায়াত-পাল বাঁধা তরণীর মাস্তুল
জান্নাত হতে ফেলে হুরী রাশ্-রাশ্ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল দাত্রী,
(খেয়াপারের তরণী, অগ্নীবীণা)

চিত্রকল্পটির প্রথম অংশটি ইসলামী ঐতিহ্য সম্পৃক্ত কিন্তু শেষ অংশটি বাঙালি হিন্দু পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে চয়ন করা, বিপরীতধর্মী ঐতিহ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে চিত্রকল্প নির্মাণে নজরুল যে সিদ্ধহস্ত উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি তারই পরিচয়বাহী।[৫]

পুরাণ-ইতিহাস-ঐতিহ্য নির্ভর চিত্রকল্পসমূহ কেবল নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার স্বরূপকে চিহ্নিত করে তাই না, প্রেমজ কামনা ও স্বপ্নময় আবেগের রূপায়ণেও তিনি মিথিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। "আধুনিক কবিতায় মানুষের মগ্নচেতনার অনেক স্বপ্ন ও প্রত্যয় এবং সামূহিক নির্জ্ঞান মিথ আকারে চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে।"[৬] যেমন—'মঙ্গলাচরণ' কবিতায় নববধূর আগমনকে সমুদ্রমন্থনজাত লক্ষ্মীর আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

উঠিছে লক্ষ্মী ওই
তোমার ক্ষুধার ক্ষীরোদ-সাগর মন্থনে সুধাময়ী।
(মঙ্গলাচরণ, সিন্ধু হিন্দোল)

উদ্ধৃটিতে কবি সমুদ্রমন্থনের সময় লক্ষ্মীর জেগে ওঠার পৌরাণিক চিত্রটি দৃশ্যময় করে তুলেছেন। দেবী-লক্ষ্মীর সৌন্দর্য, রূপলাবণ্য, স্বামীধর্ম, ঐশ্বর্য ইত্যাদি গুণাবলী উপমানচিত্রের সীমানা ছাড়িয়ে উপমেয় নববধূকে বহুগুণে গুণান্বিত করে উপস্থাপন করে।

নজরুলের রোমান্টিক চেতনার অপর একটি দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পে মদাসক্ত সম্রাটকে মদ ঢেলে দিচ্ছে সাকী। এক সময় মদ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু সম্রাটের পিপাসা মেটেনি, তাই সম্রাটের সামনে ভয়ে কাঁপে সাকী। সমুদ্রের সঙ্গে সম্রাটের পানাসক্তির সাদৃশ্য কল্পনায় নির্মিত হয়েছে অপূর্ব চিত্রকল্প—

দুরন্ত গো মহাবাহু,
ওগো রাহু
তিনভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকী
সুরা নাই-পাত্র হাতে কাঁপিতেছে সাকী।
(সিন্দু, তৃতীয় তরঙ্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

বাক্‌প্রতিমার যে নির্মাণশর্ত—কবির কল্পনাপ্রতিভা এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি, তা উপর্যুক্ত চিত্রকল্পে লক্ষণীয়। মদাসক্ত এক সম্রাটের সামনে শূণ্য পাত্র হাতে কম্পনরত এক সুন্দরী সাকী নারীর প্রতিমাচিত্র ভেসে ওঠে

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের দৃষ্টির পর্দায়। নজরুল ইসলামের প্রেমের কবিতাগুচ্ছে প্রথম দিকে মিলনের আকাঙ্ক্ষাকেই বড় করে দেখেছেন এবং তাঁর কবি হৃদয়ের আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন মিলনাত্মক চিত্রকল্পে; যদিও অন্তিম পর্যায়ে তিনি বিরহের সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেছেন। কবি সিন্ধুনদের দৃষ্টি দিয়ে সাগরের তটভূমিকে কল্পনা করেছেন নারীরূপী পৃথিবীর কটিদেশরূপে, আর কূলপ্লাবী জলরাশি যেন সমুদ্রের বাহুবন্ধন। সমুদ্র তার প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করেছে বাহুবন্ধনে। সমুদ্রের জলরূপবাহু যেন ইন্দ্রনীলাকাশে মনি মেঘলা, যে মেঘলা নৃত্যরত পৃথিবীর নিতম্বদোলার তালে দুলছে অনুপম ছন্দে। দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পটি নিম্নরূপ—

হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কটিতট আছ আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীল কান্তমনি মেঘলার সম,
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল অনুপম।
(সিন্ধু : তৃতীয় তরঙ্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

উদ্বৃটিতে উপমানের মধ্যে কবি আরোপ করেছেন—কল্পনার অপূর্ব ব্যঞ্জনা। উপমেয় ও উপমানের মিলিত বাক্‌প্রতিমায় এখানে সৃষ্টি হয়েছে হৃদয়াবেগের মাধুর্য। সমগ্র মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি অসাধারণ দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা।

নজরুলের প্রেমের কবিতায় প্রকৃতির বিচিত্র উপকরণের সন্নিবেশে দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমার উদাহরণ সুপ্রচুর। যেমন—

১. আধখানা চাঁদ আকাশ 'পরে
উঠ্‌বে যবে, গরব-ভরে
তুমি বাকি আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমায় খোপায়-জড়াতে।
(এ মোর অহঙ্কার, জিঞ্জীর)

২. ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা?
(সন্ধ্যাতারা, ছায়ানট)

৩. চাঁদ হেরিতেছে চাঁদমুখ তর সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে।।
(চাঁদ মুকুর, ছায়ানট)

৪. ঐ নীল-গগণের নয়ন পাতায়
নামলো কাজল-কালো মায়া।
বনের ফাঁকে চমকে বেড়ায়
তারি সজল আলো-ছায়া।।
(স্তব্ধ বাদল, ছায়ানট)

৫. চায় যেন সে নরম-শাড়ীর ঘোমটা চিরি, পাতা ফুঁড়ি
আধ-ফোঁটা বৌ মউল-বউল, বোলতা-ব্যাকুল বকুল-কুঁড়ি
বোল্ তোলা তার কাঁকন্ চুড়ি
ক্ষীরের ভিতর হীরের ছুরি।
দু'চোখ ভরা অশ্রু যেন পাকা পিয়াল শালের ঠেঙ্গায়।।
(মানস-বধূ, ছায়ানট)

Dhaka University Institutional Repository

৬. এবার আমার জ্যোতিগেহে তিমির প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নিবিহীন দীপ্তি শিখায় তৃপ্তি অতল কালো।
(রৌদ্রদগ্ধের গান, ছায়ানট)

৭. মর্মমূলে হান্‌লে আমার অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ ছুরি
যে খুন সখায় অর্ঘ্য দিলে যুগল চরণ-পদ্মে পুরি।
আমার প্রাণের রক্ত-কমল
নিঙড়ে হল লাল পদতল,
সেই শতদল দিয়ে তোমার নতুন রাজায় বরেছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে।।
(আরতাস্মৃতি, ছায়ানট)

৮. এবার আমার জ্যোতিগেহে তিমির প্রদীপ জ্বালো।
আনো অগ্নি-বিহীন দীপ্তি শিখার তৃপ্তি অতল কালো।
তিমির প্রদীপ জ্বালো।।
(রৌদ্রদগ্ধের গান, ছায়ানট)

৯. আমার মনের পিয়াল তমালে (হেরি তারে-স্নেহ-মেঘ-শ্যাম)
অশণি আলোক হেরি তারে থির বিজুলী উজল অভিরাম
(আপন পিয়াসী, ছায়ানট)

১০. আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভরে ওঠে সারা প্রাণ!
(ফরিয়াদ, সর্বহারা)

১১. তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান।
যুগ-যুগান্তর সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিমান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।
(কাণ্ডারী হুঁশিয়ার, সর্বহারা)

১২. তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরনীরে দিলে দান ধুলা-মাটি,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটি।
ময়ূরের মত কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া।
(ফরিয়াদ, সর্বহারা)

উদ্ধৃতিগুচ্ছে প্রথমটিতে প্রেমের অপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। হেমন্ত ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে রৌদ্রের শীত যাপনের উপলব্ধি সৃষ্টি করে বহুমাত্রিক চেতনা। জীবনানন্দ দাশ যেমন ধানের উপরে প্রভাত রৌদ্রের শায়িতাবস্থাকে গেঁয়োর অলসতার সঙ্গে তুলনা করে নির্মাণ করেন কার্তিকের শীতার্ত উপলব্ধির এক ভিন্ন মাত্রার ব্যঞ্জনা।[৭] তেমনি হেমন্তের শীতার্ত প্রকৃতির মধ্যে তুর্কী কুমারীর কুয়াশার নেকাব পরে পঞ্চম উদ্ধৃতিটিতে বর্ষা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছে। কবিতাটির নামকরণের মধ্যেও রয়েছে সেই প্রতিমার মতো স্থির অনড় স্তব্ধতা বর্ষার মতো গতিশীল এর উদ্দাম একটি প্রাকৃতিক বিষয়কে নজরুল ইসলাম 'স্তব্ধ' করে একটি অসাধারণ দৃশ্যের সৃষ্টি করেছেন। নীল গগণের পুঞ্জিভূত 'কাজল-কালো'

Dhaka University Institutional Repository

মেঘের মধ্যে মায়ার আবেগ এবং বনের ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়ার খেলায় নজরুলের দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্প নির্মাণে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নয় সংখ্যক উদাহরণেও মেঘ-বৃষ্টি-বিদ্যুতের উপমায় নজরুল প্রেমিকার রূপ-সৌন্দর্যকে চিত্রিত করেছেন। কবি তার প্রিয়াকে দেখেছেন শ্যামল মেঘের প্রতীকে এবং প্রিয়ার সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন স্থির বিদ্যুতের দৃষ্টি ধাঁধানো উজ্জ্বলতায়।

নজরুলের দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পে প্রদীপ একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। প্রদীপকে তিনি বহুভাবে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করেছেন। অষ্টম উদাহরণে (রৌদ্র-দগ্ধের গান' কবিতায়) 'তিমির-প্রদীপ' জ্বেলে অন্ধকারের সৌন্দর্যকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। মেঘ উর্বরতার উৎস, কৃষ্ণ প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন—মেঘ এবং কৃষ্ণ উভয়ই কালো। কবি তাই অতল কালোর ভেতর তাঁর চেতনার 'তিমির-প্রদীপ' জ্বেলেছেন।

কালো রঙের উপস্থাপনায় প্রদীপের অগ্নিবিহীন দীপ্তি দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্প নির্মাণ করে। দশম উদাহরণে (ফরিয়াদ কবিতায়) "আমার আঁখির দুখ দীপ"—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ম্লান কল্পনার প্রদীপ শিখার সঙ্গে বেদনা ভারাতুর অস্থির চোখের সাদৃশ্য কল্পনা অসাধারণত্ব নিয়ে আসে। ম্লান প্রদীপের কম্পিত শিখার বস্তুগত উপকরণে দুঃখের মতো ব্যক্তিচেতনার আবেগ সঞ্চার করে নজরুল মানবজীবনের চিরন্তন বেদনার প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। বার সংখ্যক উদ্ধৃতিটিতে (ফরিয়াদ কবিতায়) ময়ূরের পেখম সজ্জিত অপূর্ব দৃশ্যময়তা সৃষ্টি করে। এগার সংখ্যক উদাহরণে ('কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায়) যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা বহনকারী শোষিতের অভিযানে বঞ্চিতের বুকে পুঞ্জিভূত অভিমান ফেনা হয়ে ওঠে—উপলব্ধি এবং চেতনার সমন্বয় চিত্রকল্পে রূপলাভ করেছে।

চাঁদের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাত্রি জাগরণে দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত নজরুলের শিল্প প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে নজরুল কল্পনার অসামান্যতা প্রকাশিত। প্রিয়ার নীরবতা এবং অর্ধচন্দ্রের হাসির মধ্যে সাযুজ্য কল্পনার পরে তিনি আকাশের তড়িৎপ্রবাহ ছিঁড়ে এনে পরিয়ে দিয়েছেন প্রেমিকার খোঁপায়। চন্দ্রের চিত্রকল্প নজরুলের কবিতায় অসংখ্যবার ফিরে ফিরে এসেছে। উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহের ষষ্ঠ সংখ্যক দৃষ্টান্তে চন্দ্রের চমৎকার দৃষ্টিনির্ভর সন্ধান মেলে। দীঘির জ্বলে চাঁদের প্রতিবিম্ব এবং জলতরঙ্গের সেই প্রতিবিম্ব ভেঙ্গে যাওয়ার সঙ্গে কবিচিত্তে বাসনা ভঙ্গের অসাধারণ রোমান্টিক অনুভূতি সঞ্চার করে দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের অপূর্বত্ব।

চন্দ্র অনুষঙ্গবাহী অসংখ্য চিত্রকল্পের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পে 'চাঁদনী রাতে' কবিতায় চাঁদনী রাতকে নানা দৃশ্যচিত্রের মাধ্যমে একটি খণ্ড শোভনতায় চিত্রিত করেছেন কবি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পের মাধ্যমে চাঁদের রূপরাশি কবি প্রকাশ করেছেন এভাবে—

'আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ওকি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে সখি
(চাঁদনী রাতে, সিন্ধু হিন্দোল)

মিলনশ্রান্তিতে চাঁদের ঘর্মবিন্দু শিশিরের রূপে ঝরে পড়ার কল্পচিত্রে বাক্‌প্রতিমাটিতে এসেছে অপূর্বত্ব ও কল্পনাপ্রসারী গুণ।[৮]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের তৃতীয়টিতে সন্ধ্যাতারার মৃদু উপস্থিতি ঘোমটা পরা বৌ-এর সাদৃশ্য কল্পনা করে কবি হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বিরহচেতনা। হারিয়ে যাওয়া, স্মরণ করতে না পারার বেদনাবোধের সঙ্গে "তোমার চোখে দৃষ্টি জাগে"—এই শব্দগুচ্ছ তীব্রভাবে দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পকে সরাসরি উপস্থাপন করে। 'মানস-বধূ' কবিতায় (চতুর্থ সংখ্যক) শাড়ির বস্তুসত্তায় লজ্জাবনত আবেগচেতনার সঞ্চার এবং ঘোমটাকে পাতার সঙ্গে তুলনা করে নববধূর ব্যাকুল মুখশ্রী বকুল কুঁড়ির প্রতীকি বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার সংযোজন সূচনা করে চিত্রকল্পের অপূর্ব ব্যঞ্জনা। 'সিন্ধু' কবিতার দ্বিতীয় তরঙ্গে একটি দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্প—

অন্তরের নিষ্পেষিত ব্যথার ক্রন্দন

Dhaka University Institutional Repository

ফেনা হয়ে ওঠে মুখে বিষের মতন।
হে শিব, পাগল!
তব কণ্ঠে ধরি' রাখ সেই জ্বালা—সেই হলাহল।
(সিন্ধু, সিন্ধু হিন্দোল)

উদ্ধৃতিটিতে "প্রকাশিত হয়েছে প্রেম ও সৌন্দর্যের জন্য কবিচিত্তের অলজ্জ চিৎকার এবং বাসনাবহ্নি। অচরিতার্থতার বেদনায় কবি সমুদ্রের সঙ্গে নীলকণ্ঠ শিবের তুলনা নির্মাণ করেছেন সাযুজ্যচিত্র এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারটি অনুভূতির শোভা এবং আবেগের দ্যোতনা নিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে চিত্রকল্পে। ব্যথার ক্রন্দন এবং বিষ—এই দুই বিসাদৃশ্য ভাববস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করে কবি নীলকণ্ঠ ধূর্জটির যে চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, তা বিষয় এবং ভাবের রূপকে অতিক্রম করে তুলে ধরেছে রূপান্তরের ব্যঞ্জনা। সমুদ্রের বেদনা এবং আপন কবি আত্মার যন্ত্রণা উপস্থাপনে কবি ব্যথার ক্রন্দন এবং বিষের তীব্রতা নীলকণ্ঠ শিবের রূপকে চিত্রময় করেছেন। এই রূপকাত্মক চিত্রকল্পটিতে 'ফেনা' শব্দটি নিয়ে এসেছে চিত্রকল্পের অনিবার্য শর্ত উপমেয় উপমানের সাদৃশ্যসূত্র অতিক্রমী তৃতীয় মাত্রার ব্যঞ্জনা। সমুদ্রের ফেনার শুভ্রতা ও লবণাক্ততা বিষের মাত্রা পাবার সঙ্গে সঙ্গে কবি ব্যথাকে দূরবিস্তৃত পৌরাণিক জগতের সমুদ্রমন্থনের প্রাঙ্গনে নিয়ে যান—সৃষ্টি হয় উপমানচিত্রের অপূর্বত্ব ও কল্পনাপ্রসারীগুণ তৃতীয় মাত্রার প্রতিভাস।"[৯] কবি কল্পনার অপূর্বতার সঙ্গে সংযুক্ত 'ফেনা' শব্দটি সূচনা করে দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের অনিবার্য ইঙ্গিত।

পদ্মফুলের বিচিত্র ব্যবহারে নজরুল নির্মাণ করেছেন অসামান্য কিছু দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্প। সপ্তম সংখ্যক (আল্‌তা-স্মৃতি কবিতায়) উদ্ধৃতিটিতে কবি প্রিয়ার অপরূপ রূপ বর্ণনায় পদ্মফুলের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। পদযুগলকে লাল পদ্মফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সেই আলতা রাঙা পদতল কবির প্রাণের রক্ত-কমল নিঙড়ানো রঙে রাঙানো। পদ্মফুলের দৃষ্টিনির্ভর আরো কিছু চিত্রকল্প—

১. তোমার সখায় পূজা কি মোর গানের কমল তুলি?
তুলতে সে ফুল মৃণাল—কাঁটায় বেঁধে কি অঙ্গুলি?
(নদীপারের মেয়ে, চক্রবাক)

২. আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল।।
(ছাত্রদলের গান, সর্বহারা)

কেবল পদ্মফুল নয় বিচিত্র ফুলের সমাবেশে নজরুল প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করেছেন। কখনও পুষ্পের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে প্রেমিকার রূপ হয়ে উঠেছে কামনা মদির বিরহচেতনায় ব্যাকুল। যেমন—

১. বাঁকা পলাশ-মুকুলে কার আনত আঁখি?
ওগো রাঙা-বৌ বনবধূ রাগিল না কি?
(মাধবী-প্রলাপ, সিন্ধু-হিন্দোল)

২. পলাশ ফুলের পেয়ালা ভরিয়া পুরিয়া উঠেছে মধু
তব অন্তরে সঞ্চরে আজ সৃজন-দিনের বধূ।
(মাদলাচরণ, সিন্ধু হিন্দোল)

৩. বন্ধু, তব জীবনের কুমারী আশ্বিন
পরিল বিধবা বেশ কবে কোন দিন
কোন্ দিন সেঁউতির মালা হতে তার

Dhaka University Institutional Repository

ঝরে গেল বৃন্তগুলি রাঙা কামনার—

(গোকুলনাগ, সর্বহারা)

নজরুল ইসলাম দোলন-চাঁপা (১৩৩০), ছায়ানট (১৩৩২), সিন্ধু-হিন্দোল (১৩৩৪) ইত্যাদি প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলিতে প্রেমচেতনার মিলন-আকাঙ্ক্ষাকে বড় করে তুলেছেন, কিন্তু চক্রবাক (১৩৩৬) কাব্যে তাঁর প্রেমবোধ ক্রমশ লাভ করেছে সংহতি। প্রথম পর্যায়ে প্রেমের স্বরূপ নির্মাণে নজরুল শাশ্বত বিরহকে চিহ্নিত করতে পারেননি। কিন্তু চক্রবাক কাব্যে তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করেছেন প্রেমের ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তিই সত্য ও শাশ্বত, মিলন নয় বিরহই চিরায়ত সত্য। প্রথম পর্বের কাব্যে বিরহবোধের প্রকাশ আছে, তবে এ পর্বের কবিতায় কবির স্বভাবগত উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা কিংবা মান-অভিমান আর হৃদয়ের বিক্ষোভ প্রবল এবং নজরুলের এ সকল কবিচেতনার সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞালালিত একটি প্রেমবোধ সংযুক্ত হয়েছে 'চক্রবাক' কাব্যে। দৃষ্টিনির্ভর অসংখ্য চিত্রকল্পে নজরুলের প্রেমচেতনার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১. ধরণী দিয়াছে তার
গাঢ় বেদনার
রাঙা মাটি-রাঙা ম্লান ধূসর আঁচলখানি
দিগন্তের কোলে কোলে টানি।

(বেলাশেষে, দোলনচাঁপা)

২. অস্ত্র-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়।
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে।।

(পউস, দোলনচাঁপা)

৩. বিরহের কান্না-ধোওয়া তৃপ্ত হিয়া ভরি
বারে বারে উদিয়াছ ইন্দ্রধনু-সমা
হাওয়া-পরী
প্রিয় মনোরমা।

(অ-নামিকা, সিন্ধু-হিন্দোল)

৪. ঘর-দুয়ার আজ বাউল যেন শীতের উদাস মাঠের মত
ঝরছে গাছে সবুজ পাতা আমার মনের বনের যত।

(উন্মনা, ঐ)

৫. অস্ত-আকাশ-অলিন্দে তার শীর্ণ কপোল রাখি
কাঁদিতেছে চাঁদ,

(বাতায়ন-পাশে গুবাক-তরুর সারি, চক্রবাক)

৬. শীতের কুহেলি ঢাকা বিষণ্ন বয়ানে
কিসের করুণামাখা! কুলের সিথানে
এলায়ে শিথিল দেহ আছ একা শুয়ে,
বিশীর্ণ কপোল বালু-উপাধানে থুয়ে।

(শীতের সিন্ধু-ঐ)

৭. দেখা দিলে রাঙা মৃত্যুর রূপে এতদিনে কিগো রানী?
মিলন গোধূলি-লগনে শুনালে চির বিদায়ের বাণী।

Dhaka University Institutional Repository

যে ধূলিতে ফুল ঝরায় পবন
রচিলে সেথায় বাসর শয়ন,
বারেক কপোলে রাখিয়া কপোল, ললাটে কাঁকন হানি,
দিলে মোর পরে সকরুণ করে কৃষ্ণ কাফন টানি।

(সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে, ঐ)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছে প্রথমটিতে সন্ধ্যার আবির্ভাবকে বেদনাবিধুর পল্লীবধূর রূপকে দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছে। 'ম্লান' এবং 'ধূসর'—এই শব্দ দুটি কবিচেতনার বেদনাবোধকে তীব্রতা দান করেছে। তৃতীয় লাইনে একটি অনুপ্রাসের মাধ্যমে ধূসর আঁচল টেনে-টেনে নেবার উপলব্ধি বিরহকাতর বধূর রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় সংখ্যক উদাহরণেও সন্ধ্যা প্রকৃতিকে কবি বিরহকাতর বধূর চিত্রকল্পে রূপময় করে তুলেছেন। সন্ধ্যাকে কবি যেমন তাঁর চেতনার অধরা প্রেমিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন তেমনি নিসর্গের বিভিন্ন উপাদানে আপন হৃদয়ের বিরহসিক্ত বেদনাবোধের চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন তিনি। 'অ-নামিকা' কবিতায় (তৃতীয় সংখ্যক) উপমানচিত্র ইন্দ্রধনুর সত্তায় হাওয়াপরীরূপী কবি অধরা প্রেমিকাকে কল্পনা করেছেন। রঙধনুর বর্ণশোভা, সৌন্দর্য এবং ক্ষণস্থায়িত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে কবিপ্রিয় অ-নামিকা নায়িকার উপর। আবার 'উন্মনা' কবিতায় (চতুর্থ সংখ্যক) বিরহবেদনায় কবির হৃদয়শূন্য, উদাস বাউলের মতো রিক্ত তার মনোলোক।

কবির এই বিরহচেতনা রিক্ত শীতের পাতাঝরা বৃক্ষের রূপকে কল্পিত হয়েছে। 'বাউল' এবং 'উদাস মাঠ' এই শব্দগুচ্ছ কবিচেতনার বিরহবোধকে জাগ্রত করে। বাউল এবং পাতা ঝরে পড়ার দৃশ্য দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পে হয়েছে ব্যঞ্জনাময়।

নিসর্গের বিচিত্র উপাদানকে কবি কল্পনা করেছেন তাঁর মানসপ্রিয়ার প্রতিরূপ হিসেবে। 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' (পঞ্চম সংখ্যক) কবিতায় গুবাক-তরুর প্রতীকে শিল্পমূর্তি পেয়েছে কবির সৌন্দর্যময় প্রেমিকার শরীর ও হৃদয়। সমাসোক্তি অলঙ্কারের দ্বারা কবি প্রেম ও প্রকৃতির ব্যবহারে মানবহৃদয়ের চিরন্তন বিরহ ও যন্ত্রণাকে রূপদান করেছেন। 'শীতের সিন্ধু' কবিতায়ও (ষষ্ঠ সংখ্যক) শীত ঋতুর রিক্ততার দ্বারা কবিহৃদয়ের বিরহকে রূপময় করা হয়েছে। 'বিষণ্ন', 'করুণামাখা', 'শিথিলদেহ', 'বিশীর্ণ কপোল' ইত্যাদি শব্দবন্ধ সেই বিরহ-বেদনা ও যন্ত্রণাকে দৃশ্যময় করে তোলে।

'সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে' কবিতায় (অষ্টম সংখ্যক) কবির মৃত্যুচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। ক্ষণিকাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা যখন ব্যর্থ হয়, শাশ্বতীও তখন থেকে যায় অধরা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তখন মৃত্যুর সান্নিধ্য কামনা করেন—"এসো হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে।"[১০]

নজরুলও তেমনি বাস্তব পৃথিবীর অধরা প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুকে কামনা করেছেন। মৃত্যুকে তিনি কল্পনা করেছেন, তাঁর মানসপ্রতিমা রূপে। গোধূলি প্রকৃতি এখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। গোধূলির রাঙা প্রকাশ মৃত্যুর প্রতিরূপ এবং মৃত্যু কবির প্রেমিকার রূপক। বাতাসে ধূলির ঝরা ফুলে ফুলশয্যা রচনা করে কবি-প্রিয়া কালো কাফনে কবিকে আবৃত করে। কবি এখানে হয়ে উঠেছেন বর-প্রতিম। 'কৃষ্ণ কাফন'—কাফনের কৃষ্ণ রঙ সংযোজন সূচনা করে ভিন্নমাত্রার ব্যঞ্জনা ধূলিতে ঝরা ফুল এবং 'কৃষ্ণকাফন' দৃশ্যমানতা দান করে দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের অনিবার্যতাবোধ।

'দারিদ্র্য' কবিতায় নজরুলের দৃষ্টিনির্ভর দু'টি উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প—

১. হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।

(দারিদ্র্য, সিন্ধু- হিন্দোল)

২. আশ্বিনের প্রভাতের মতো ছলছল

Dhaka University Institutional Repository

করে ওঠে সারা হিয়া শিশির সজল
টলটল ধরণীর মত করুণায়।
(ঐ)

'দারিদ্র্য' কবিতাটি শুরু হয়েছে একটি অসাধারণ চিত্রকল্পের মাধ্যমে (প্রথম সংখ্যক)। যিশু খ্রিষ্ট নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীর মানুষের পাপ-অন্যায়-অপরাধ মোচন করে সত্যের বাণী প্রচার করেছিলেন, মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন। তেমনি দারিদ্র্যের অসহনীয় যন্ত্রণা কবিকে মহান করে তুলেছে। যিশুর মতো কবিও ক্ষুধার জ্বালা বুকে ধারণ করে সম্মানবোধ করেন। 'কণ্টক-মুকুট' শোভা— এই শব্দগুচ্ছ নিয়ে আসে অনিবার্যভাবে খ্রিষ্টের চিত্র সম্বলিত দৃশ্যময়তা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কবির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে গেছে দারিদ্র্যের নির্মম নিষ্পেষণে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁর বেদনাবহ হৃদয় শিশিরসিক্ত আশ্বিন ঋতুর প্রভাতের উপমানচিত্রে রূপলাভ করেছে। এখানে 'র' এবং 'ল' ধ্বনির অনুপ্রাস দুটি উপমা এবং উপমেয়-উপমানের দৃষ্টিগ্রাহ্যতা বাক্‌প্রতিমাটিকে অপূর্বত্ব দান করেছে।

নজরুল ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছেন মালা-চিত্রকল্প। একটি বাক্‌প্রতিমার বিশেষ ইন্দ্রিয়চেতনা যখন অন্য বাক্‌প্রতিমায় ভিন্নতর ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে, কখনো একই সঙ্গে দুইটি তিনটি অথবা ততোধিক চিত্রকল্পের ইন্দ্রিয় সংবেদনার সমন্বয় ঘটে তখন সৃষ্টি হয় মালাচিত্রকল্প বা chain-imagery. এই ধরনের বাক্‌প্রতিমায় সাধারণত মালাউপমা বা মালারূপক অসাধারণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। এ ধরনের একটি চিত্রকল্প নিম্নরূপ—

কারে আজ
পরাজিত কবি রণে, তব প্রিয়া রাজ-দুহিতারে
আনিবে হরণ করি?—সারে, সারে
দলে দলে চলে তব তরঙ্গের সেনা,
উষ্ণীয় তাদের শিরে শোভে শুভ্র ফেনা।

ঝটিকা তোমার সেনাপতি
আদেশ হানিয়া চলে উর্ধ্বে অগ্রগতি।
উঠে চলে মেঘের বেলুন
'মাইন্' তোমার চোরা পর্বত নিপুণ।
হাঙ্গর কুম্ভীর তিমি চলে 'সাবমেরিন'
নৌ-সেনা চলিছে নীচে মীন।
সিন্ধু-ঘোটকেতে চড়ি চলিয়াছ বীর
উদ্দাম অস্থির।
(সিন্ধু, দ্বিতীয় তরঙ্গ)

নজরুল তাঁর কবিসত্তার বিদ্রোহচেতনা প্রকাশ করতে গিয়ে যে যুদ্ধদৃশ্য অঙ্কণ করেছেন, সেখানে সৃষ্টি হয়েছে মালা-চিত্রকল্প। 'তরঙ্গের সেনা', 'শুভ্র ফেনা', 'মেঘের বেলুন' ইত্যাদি শব্দপুঞ্জ দৃষ্টিনির্ভর বাক্‌প্রতিমাকে অনিবার্যভাবে রূপদান করে।

দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের এমন প্রচুর উদাহরণ নজরুলের কাব্যসম্ভার থেকে তুলে আনা সম্ভব। পুরাণ-ঐতিহ্য-ইতিহাস নির্ভর চরিত্রের বিবিধ উপস্থাপনা, লোকজ উপকরণ এবং প্রকৃতির বিচিত্র উপাচার এনে কবি তার কাব্যজগৎ সৃষ্টি করেছেন। কখনও একটি দু'টি শব্দের মাধ্যমে কখনও একটি দুটি বাক্যের ব্যবহারে, কখনও একাধিক উপমানচিত্র, রূপক প্রতীক ইত্যাদি অলঙ্কারের দ্বারা নজরুল ইসলাম সৃষ্টি করেছেন দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পের অসাধারণ দৃষ্টান্তসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. নজরুলের সমগ্র কবিতাকে আব্দুল মান্নান সৈয়দ দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি সমাজ-সত্তায় সমর্পিত, অপরটি ব্যক্তিগত নিঃসরণে। তাঁর শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ :

ক. অগ্নি-বীণা (১৯৯২)
বিষের বাঁশী (১৯২৪)
ভাঙার গান (১৯২৪)
সাম্যবাদী (১৯২৫)
সর্বহারা (১৯২৬)
ফণি-মনসা (১৯২৭)
সন্ধ্যা (১৯২৯)
প্রলয় শিখা (১৯৩০)

খ. দোলন-চাঁপা (১৯২৩)
ছায়ানট (১৯২৫)
পুবের হাওয়া (১৯২৫)
সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৭) বিমিশ্র
জিঞ্জীর (১৯২৮) বিমিশ্র
চক্রবাক (১৯২৯)

- ইত্যাদি।

আব্দুল মান্নান সৈয়দ : *নজরুল ইসলাম/কবি ও কবিতা*, নজরুল একাডেমী, ঢাকা আগস্ট, ১৯৭৭, পৃঃ ২৫৪।

২. সৈয়দ আকরম হোসেন : *নজরুলের নটরাজ : বিশ্বছন্দের প্রতুপ্রতিমা : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫, পৃঃ ৬৯।

৩. রফিকুল ইসলাম : *নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার, সাহিত্য পত্রিকা*, অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

৫. প্রাগুক্ত।

৬. বার্নিক রায় : *কবিতা ঃ চিত্রিত ছায়া*, কলকাতা, ১৩৭৮, পৃঃ ৩৪।

৭. শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ক্ষেতে।
(অবসরের গান, ধূসর পাণ্ডুলিপি : জীবনানন্দ দাশ)

৮. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩, পৃঃ ৪৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭।

১০. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : *'মহানিশা', উত্তর ফাল্গুনী, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮৪ পৃঃ ১৮১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে ঘ্রাণনির্ভর বাক্‌প্রতিমা

ঘ্রাণ ব্যক্তির মনে জাগিয়ে তোলে স্মৃতি এবং আবেগ। কখনো জাগিয়ে তোলে শরীরী চেতনার তীব্র উপলব্ধি। নজরুল ইসলামের কবিতায় কবিচেতনার আবেগ, উপলব্ধি, স্মৃতি, বেদনা, যন্ত্রণা আবার কখনো আনন্দ প্রকাশে ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে শরীরী উপস্থাপনায় ঘ্রানেন্দ্রিয়ের চমৎকার ব্যবহার নজরুলের কবিতায় পাওয়া যায়। প্রকৃতির উপাদানের সঙ্গে কবিচেতনার আবেগ-উপলব্ধি সঞ্চারের ফলে কবিতায় তৈরি হয়েছে অসাধারণ চিত্রকল্প। যদিও দৃষ্টিনির্ভর বা অন্যান্য চিত্রকল্পের তুলনায় নজরুল কাব্যে ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্প প্রচুর নয়। কিন্তু অল্পসংখ্যক ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পই তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ খুবই সীমিত সংখ্যক কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। মূলত বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশে যেখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেছেন সেখানে তিনি অনিবার্যভাবে সন্ধান করেছেন পৌরাণিক উৎস। যেমন—

এসো কন্যা উমা, এসো গৌরী রূপে—
বাজো শঙ্খল শুভ, জ্বালো গন্ধ ধূপে।
(জাগৃতি, বিষের বাঁশি)

পৌরাণিক উৎস ছাড়াও বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশে প্রকৃতির বিচিত্র উপদান ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তাকে জাগ্রত করেছে। যেমন—

১. কচি শিশু রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া কাল,
আর বদ্ধ কারায় ধোঁয়া, এসিড পটাস, মোনছাল,
...
আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু,
(ধুমকেতু, অগ্নিবীণা)

২. হোক রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান,
আজি বন্ধ সবার পূর্তি-গন্ধে নিশাস,
বিষে বিশ্ব-নিসাড়, বহে জোর নাভি-শ্বাস।
(জাগৃতি, বিষের বাঁশি)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দুটির প্রথমটিতে পোড়া মরিচের এবং বদ্ধ কারাগারে রাসায়নিক বিবিধ দ্রব্যের তীব্র ঘ্রাণ জাগিয়ে তুলেছে কবির বিদ্রোহের উত্তাপকে। দ্বিতীয় উদাহরণে পৃথিবীর পূতি-গন্ধময় অস্থির সমাজ যুদ্ধবিধ্বস্ত সময় কবির স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ, যন্ত্রণা, শোক, অবিশ্বাস, অত্যাচার আর সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কবির আজন্ম সোচ্চার প্রাণ পৃথিবীর নির্মম অত্যাচারী শ্বাসকষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। বিশ্ববিধাতারূপী শাসকচক্রের অটল আসনকে কবি ধ্বংস করতে চান। তাদের অত্যাচারে পৃথিবী নিঃসাড় জর্জরিত। প্রথম উদ্ধৃতিটিতে কবিচেতনা পোড়া মরিচ আর রাসায়নিক উপাদানের ঝাঁঝালো গন্ধের রূপক এবং দ্বিতীয়টিতে পূতিগন্ধময় পৃথিবী কবিকে জাগ্রত করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রসারণে উদাহরণ দু'টি ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পের অনিবার্যতা পেয়েছে।

নজরুলের বিদ্রোহ ও প্রেম পরস্পর পরিপূরক। পরাধীন সমাজের স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য আবার সমাজের সকল অসত্য, অন্যায়, অকল্যাণ দূর করার জন্য যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন তেমনি প্রেমের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থতায়ও তিনি বিদ্রোহ করেছেন। একারণে 'বিদ্রোহী' কবিতায় একই সঙ্গে নজরুলের বিদ্রোহী ও প্রেমিক সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 'আগামী' কবিতায় যুদ্ধের তাণ্ডবতার মধ্যে প্রিয়ার কেশের ঘ্রাণ তাই কবিকে উন্মাতাল করেছে।

ঐ শেফালিকা তলে কে বালিকা চলে?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন হাওয়া।
(আগমনী, অগ্নিবীণা)

শেফালী ফুলের শুভ্রতার মধ্যে বালিকার আগমন এবং তার সঙ্গে কেশের ঘ্রাণ কবির আবেগ-চেতনার প্রকাশে ঘ্রাণের অপূর্বত্ব সৃষ্টি করে অসাধারণ চিত্রকল্প। ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম শেফালি ফুলের বিচিত্র ব্যবহার তুলে এনেছেন। কেবল প্রেমের প্রকাশক হিসেবে তিনি শেফালি ফুলের শুভ্রতা ও ঘ্রাণকে, ব্যবহার করেননি, বরং দুঃখ দারিদ্র্য-বঞ্চনার চিত্রকল্প হিসেবেও তা পৃথকভাবে মূল্যবান। যেমন—

১. বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
(দারিদ্র্য, সিন্ধু-হিন্দোল)

২. ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম-স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি,

এখানে প্রথম উদ্ধৃতিটিতে হলুদ বিবর্ণ বৃন্তচ্যুত শেফালির শুভ্রতার সঙ্গে কবির কামনার বিকাশ এই আবেগের সঙ্গে ঘ্রাণের বিমূর্ত চেতনা বাক্‌প্রতিমাটিকে দান করেছে সার্থকতা। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বৃন্তচ্যুত শেফালি ফুলের ঝরে-পড়াকে কবি বিধবার হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিধবার হাসির বেদনা, যন্ত্রণা ও অসহায়তার উপমান চিত্রে শিউলি ফুলের ঝরে-পড়ার গতিময় দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ঘ্রাণচেতনা। ফলে চিত্রকল্পটিতে সৃষ্টি হয়েছে আবেগের অপূর্বতা।

ঘ্রাণনির্ভর বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টিতে নজরুল অন্যান্য ফুলের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। যেমন—

১. তরী আমার কোন কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কমলা নেবুর ফুল।
(চৈতী হাওয়া, ছায়ানট)

২. কিসের তোমার শঙ্কা এ আমি জানি।
পরাণের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল-গন্ধ
পাপ্‌ড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,
যত আপনারে, লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি,
(ভীরু, চক্রবাক)

400653

প্রথম সংখ্যক উদ্ধৃতিতে কমলা লেবুর ঘ্রাণ প্রেমের ব্যর্থতায় দিশেহারা কবির স্মৃতিকে জাগ্রত করেছে। ঘ্রাণ একটি বিমূর্ত চেতনা—এর সঙ্গে 'পাঠায়' এই ক্রিয়াপদ সংযোজনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে গতিময়তা। দ্বিতীয় সংখ্যক উদাহরণে প্রেমের তীব্র আবেগ প্রকাশে নজরুল শরীরী চেতনার আশ্রয় নিয়েছেন। বকুলের মদির ঘ্রাণ কবির প্রেমকে করে তুলেছে অপ্রতিরোধ্য। প্রেমিকার লজ্জা, শঙ্কা বকুলের গন্ধে দূরীভূত হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রকাশিত হয়েছে উগ্র কামনা। 'বুকের-বকুল গন্ধ' এই শব্দগুলি প্রেমিকার হৃদয়ের কামনাকে রূপময় করে তোলে। কবি হৃদয়ের আবেগধর্মের সঙ্গে ঘ্রাণ যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে অপূর্ব চিত্রকল্প। 'দোলন চাপা' কাব্যের 'পূজারিনী' কবিতায় ঘ্রাণনির্ভর বাক্‌প্রতিমার চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন—

১. প্রথম উঠিল কাঁদি অপরূপ ব্যথা-গন্ধ নাভি-পাম-মূলে।
খুঁজে ফিরি কোথা হতে এই ব্যথা ভারাতুর মদ-গন্ধ আসে—
(পূজারিনী, দোলনচাঁপা)

২. কোথা হতে কেন এই মৃগ-মদ-গন্ধ ব্যথা আসে?
মন-মৃগ ছুটে ফেরে, দিগন্তের দুলি' মোর ক্ষিপ্ত হাহাকার-ত্রাসে।
কস্তুরী হরিণ-সম
আমারি নাভির গন্ধ খুঁজে ফেরে গন্ধ-অন্ধ মন-মৃগ মম।
(ঐ)

নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ রীতি অনুসরণ করেছেন। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি দুটি তারই পরিচয় বহন করে। ব্যথা ভারাতুর মদ-গন্ধ; 'মৃগ-মদ-গন্ধ-ব্যথা', 'গন্ধ-অন্ধ-মন-মৃগ'— এই তিনটি বাক্যাংশে একটি উদ্ভিন্ন যৌবনা চঞ্চল হরিণীর চিত্রকল্প[১] সৃষ্টি হয়েছে। বাক্যাংশগুলোর শব্দসমূহের পারস্পারিক সঙ্গতির ভেতর গন্ধ শব্দটির বৈচিত্রময় সংযোজন, যেমন—'ব্যথা গন্ধ', 'মদ-গন্ধ', 'গন্ধ-অন্ধ', বহুমাত্রিক অর্থ সৃষ্টি করে। 'ঘ্রাণ' একটি বিমূর্ত বিষয়। তার সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি-কল্পনা এবং বস্তুগত উপলব্ধি বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ চিত্রকল্প।

'পূজারিনী' কবিতার অপর একটি ঘ্রাণ নির্ভর চিত্রকল্পে পদ্মফুলের অপূর্ব সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে গিয়ে কবি ঘ্রাণের তীব্র আবেগে আকুল হয়েছেন।

যেন কোন রূপ কমলেতে মোর ডুবে গেল আঁখি
সুরভিতে মেতে ওঠে বুক,
উলসিয়া বিলসিয়া উথলিল প্রাণে
এ কী ব্যগ্র-উগ্র ব্যথা-সুখ।
(পূজারিনী, দোলনচাঁপা)

ঘ্রাণ কবির শরীরী চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে। কেশের সোঁদা ঘ্রাণ কবির হৃদয়ের স্মৃতিকে জাগ্রত করে। কখনও কবিকে করেছে বিরহে কাতর কখনও প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় তীব্রভাবে কাতর। যেমন—

১. সুদূর প্রবাসে ঘুম নাহি আসে কার সখার,
মনে পড়ে শুধু সোঁদা সোঁদা বাস এলো খোঁপার,
আকুল কবরী, উল্‌ঝলুল!!
(ঈদ মোবারক জিঞ্জীর)

২. আমারে পাঠাস্ সোঁদা-সোঁদা বাস তোর ও মাটির সুরভি
প্রভাত ফুলের পরিমল মধু, সন্ধ্যাবেলার পূরবী।
(রাখিবন্ধন, সিন্ধু-হিন্দোল)

৩. কবরীর সোঁদা-ঘসা পরিমল-ধূল,
...
অঙ্গের সুরভি মাখা ত্যক্ত তপ্ত বাস

Dhaka University Institutional Repository

মহুয়ার মদ সম মদির নিঃশ্বাস
পূরবের পরীস্থান হতে ভেসে আসা—
কিছুই পাব না খুঁজি?

(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

৪. তোমার মদির শ্বাসে কি মোর গুলের সুবাস মেনো?
আমার বনের কুসুম তুলি, পর কি আর কেনো?

(নদী পারের মেয়ে, চক্রবাক)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের প্রথম সংখ্যকটিতে স্মৃতিতে খোঁপার ঘ্রাণের আবেশ কবিকে সুদূর প্রবাস জীবনে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। অন্ধকার নির্ঘুম রাত্রি অতিবাহিত হয় প্রিয়ার স্মৃতি রোমন্থন করে। দ্বিতীয় সংখ্যক উদাহরণে কবি তাঁর প্রিয়াকে সুরভি পাঠাতে অনুরোধ করছেন। বিমূর্ত নিবস্তুক একটি উপকরণ পাঠানোর আবেদন এবং কবির প্রতীক্ষার আবেগ সৃষ্টি করেছে ঘ্রাণনির্ভর অপূর্ব একটি চিত্রকল্প। তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে সৃষ্টি হয়েছে ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পের এক অসাধারণ ব্যঞ্জনা। 'কবরীর সোঁদা-ঘসা' শব্দগুচ্ছ সোঁদা ঘ্রাণ ও স্পর্শের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তারপরই শরীরের ঘ্রাণের সঙ্গে মহুয়ার মদির নিঃশ্বাস একটি তীব্র ঘ্রাণের উপস্থিতি সৃষ্টি করে।

ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পে বস্তুগত উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুল তাঁর চারপাশের পরিচিত জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। গুল, মদ, কেশ, শরীর ইত্যাদি উপকরণ তাঁর ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্পের সীমানাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। পঞ্চম সংখ্যক উদ্ধৃতিটিতে (নদীপারের মেয়ে কবিতায়) গুলের ঘ্রাণের সঙ্গে বনফুল আর কেশের উপস্থিতি কবির প্রেমকল্পনায় ভিন্নমাত্রা সৃষ্টি করে।

আবার ধূপের ঘ্রাণ নজরুলের ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সহজাত উপকরণ হিসেবে এসেছে। যেমন—

১. নিশ্চল নিশ্চুপ
আপনার মনে পুড়ির একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।

(বাতায়ন-পাশে-গুবাক তরুর সারি, চক্রবাক)

২. গুলে-বকৌলি উর্বশীর এ চাঁদনী চক
চাও হেথায় রূপ নিছক।
শরাব সাকি ও রঙে রূপে
আতর লোবান ধূনা ধূপে
সয়লাব সব যাক ডুবে,

(নওরোজ, জিঞ্জীর)

উপর্যুক্ত প্রথম সংখ্যক উদ্ধৃতিতে ধূপের ঘ্রাণ একটি পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করে। কবির বিরহ চেতনা এখানে কবিকে একটি শান্ত সমাহিত এবং একাকীত্বের ভেতর নিয়ে যায়। কবিকে আর এই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে ধূপের পুড়ে নিঃশেষ হওয়ার বেদনা-জ্বালা-যন্ত্রণার সমন্বয় সাধন এবং সেখানে ঘ্রাণের ব্যবহার সৃষ্টি করেছে চিত্রকল্পের অপূর্বত্ব। দ্বিতীয় সংখ্যক উদাহরণে ধূপের সঙ্গে লোবানের সংযোগে একটি আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পে ধূপের ব্যবহার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পাওয়া যায়।

'ঝরাপালকে'র কবিতায় যেমন—

চুয়া চন্দন-গন্ধ বিলায়ে আমরা ঝরিয়া পড়ি
সুবাস ছড়াই উশীরের মত—ধূপের মতন দেহি।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনানন্দ দাশের কবিতায়[২] প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানে ঘ্রাণনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টির প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে জীবনানন্দ দাশ ও নজরুল ইসলাম উভয়েই রোমান্টিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু উভয়ের মৌলিক পার্থক্য হলো, জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতির উপকরণ ব্যবহার করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে প্রেমের প্রত্যাশা করেছেন। অন্যদিকে নজরুল তাঁর পরিচিত অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করে প্রেমের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর প্রেম তাই একান্তই শরীরকেন্দ্রিক। কখনও তা মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, কখনও বিরহবোধের যন্ত্রণাকাতর। কখনও ঘ্রাণের মধ্য দিয়ে স্মৃতির জাগরণ ঘটেছে তাঁর কবিতায়। আর সেই স্মৃতি কবিকে করে তুলেছে দুঃখী। আবার কখনও বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশেও নজরুল সৃষ্টি করেছেন ঘ্রাণনির্ভির চিত্রকল্প। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টিই নজরুলের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়।

তথ্যসূত্র

১. নজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার : *আবেগ-উদ্দীপনার অনুষঙ্গ*, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, নজরুল সমীক্ষণ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃঃ ৩২৮।

২. বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : *কবিতায় চিত্রকল্প ঃ কবি জীবনানন্দ দাশ*, শ্যামল কুমার ঘোষ, কলকাতা ১৩৯৪, পৃঃ ২১০।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা

কবিতায় নজরুল ইসলাম প্রথম থেকেই একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেন। তাঁর এই নতুনত্বের প্রকাশ ঘটেছে বিষয়ের সঙ্গে শব্দ সংযোজন, ছন্দ ও চিত্রকলা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুলের কবিতার এই বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। কখনও শব্দের গ্রন্থণায় শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে কবিচেতনার আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। আবার "শ্রুতিবাহিত চিত্রকল্পের সার্থকতা কবির ছন্দশিল্পের উপর দক্ষতার প্রমাণ রাখে। ... শব্দ ব্যবহারের দক্ষতায় যেমন অনেক দৃষ্টিগ্রাহ্য বাক্‌প্রতিমা নির্মিত হয়েছে, তেমনি ঐ ছন্দ ব্যবহারের কুশলতায় বহু শ্রবণ প্রতিমা সৃজিত হয়েছে।"[১] ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে অপরাপর ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মতো শ্রবণ ইন্দ্রিয়নির্ভর বাক্‌প্রতিমার ক্ষেত্রেও নজরুল বিদ্রোহ ও প্রেম, বিরহ ও বিষণ্নতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বজ্র, নূপুর, অশ্বের হ্রেষা, কাকনের ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার বৃষ্টির রিমঝিম তাঁর অধিকাংশ শ্রুতিময় বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের উপকরণ।

বিদ্রোহচেতনার বহিঃপ্রকাশে নজরুল উচ্চ শব্দের বিচিত্র ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। উচ্চস্বরে হাসির শব্দ অথবা অশ্বের তীব্র চিৎকারে কবি বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার শিরোনামের মধ্যেই একটি উচ্চকিত আনন্দ ধ্বনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে ধ্বংসের উন্মাদনা। 'শব্দ সর্বময় চৈতন্যের ধারক।'[২] একটি শব্দের মাধ্যমেই নজরুল শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমার মিশ্র আবেগকে নির্মাণ করেছেন অসাধারণ মেধায়। প্রলয়োল্লাস কবিতায় শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত—

১. ব্রজ-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর।
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।।

(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

২. অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।।

(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

৩. রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন ব্রজ-গানে ঝড়-তুফানে
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে।

(ঐ)

নজরুল ইসলাম "বারবার ঝড়ের প্রতীককে ব্যবহার করেছেন ঝড় বা কালবৈশাখী নজরুলের কবিতায় নিছক প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং সংঘাত, সংগ্রাম, পরিবর্তন, পুরাতনের বিলোপ ও নতুনের আবাহনের রূপক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। কালবৈশাখীর ঝড় নজরুলের কবিতায় নতুনের কেতনের চিত্রকল্প, তিনি যার জয়ধ্বনি করার আহ্বান জানিয়েছেন কবিতাটির প্রতিটি স্তবকে। ঝড়ের চিত্রকল্পে ভয়ঙ্করের আগমনকে এ কবিতায় প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, প্রলয়-নেশার নৃত্য পাগল যে ভয়ঙ্কর শক্তি সিন্ধু পারের সিংহদ্বারের আগলকে ধমক হেনে ভেঙ্গে দিল মৃত্যুগহন অন্ধকূপে মহাকালের চণ্ডরূপে বজ্রশিখার মশাল জ্বেলে ধূম্র ধূপে যে ভয়ঙ্করের চিত্রকল্প নজরুল অঙ্কণ করেছেন তা বাহ্যত প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতিমূর্তি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবেরই চিত্রকল্প।"[৩]

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের প্রথমটিতে ব্রজশিখার মশাল জ্বেলে ভয়ঙ্করের আগমনের হাসির উচ্চকিত ধ্বনি চিত্রকল্পটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দ্বিতীয় সংখ্যক উদাহরণে অট্টরোল আর হট্টগোলের হৈ চৈ পূর্ণ শব্দের মধ্যে চরাচরের স্তব্ধতা—এই স্ববিরোধী বিষয়কে উপস্থাপন করে নজরুল শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমাকে একটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা দান করেছেন। তৃতীয় উদ্ধৃতিটিতে 'ঝড়ের ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর রূপের এক বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করি, ঝড়, মেঘ বজ্র বিদ্যুতাহত অসীম আকাশকে তীব্রগতিসম্পন্ন অশ্বরূপে কল্পনা করে সৃষ্ট হয়েছে এই অভিনব চিত্রকল্পটি। এরূপ চিত্রকল্প নজরুলের মৌলিক কবি প্রতিভার সৃষ্টি ও বাংলা কবিতায় নতুন সংযোজন। বিশেষত : "ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে" চিত্রকল্পটি তুলনারহিত।'[৪] তীব্রগতিসম্পন্ন অশ্বের রূপে কল্পিত ভয়ঙ্কর আকাশের চিত্রকল্পে হ্রেষার কান্না ও বজ্রের গান—ধ্বনির এই বিপরীত ও মিশ্রক্রিয়া নজরুলের শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টির প্রজ্ঞাকে প্রসারিত করে দেয়। অশ্ব নজরুল ইসলামের চিত্রকল্পের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। অশ্ব গতি ও তীব্রতার প্রতীক। ঝড় কবিতায় ঝড়ের প্রতিরূপ হিসেবে অশ্বের বিচিত্র ব্যবহার লক্ষণীয়। তাঁর এই অশ্ব বিপ্লবের প্রতীক। সে চিৎকারে ক্ষুরের আঘাতে সবকিছু পদদলিত করে বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হয়।

বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—
ঐ শোনো, শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,
ঐ তার ক্ষুর হানা মেলে।—

(ঝড়, বিষের বাঁশী)

অশ্বের চিৎকার গতি যেমন নজরুলের বিপ্লবী চেতনার প্রতীক তেমনি অশ্বকে বাহন করে কবি বিদ্রোহের বাণীকে ছড়িয়ে দিতে চান—

তাজি বোররাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মত-হ্রেষা হেঁকে চলে।

(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

নজরুল ইসলাম একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রথম পর্যায়ের কাব্য রচনা করেছেন। বিদ্রোহ, বিপ্লবের মাধ্যমে সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান চেয়েছেন তিনি। পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীকার প্রত্যাশায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি খুব সচেতনভাবে তার কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণ না করলেও বক্তব্য প্রকাশে চিত্রকল্পের বিচিত্র ব্যবহার করেছেন। ফলে সাধারণ শব্দ কেবল ছন্দবদ্ধ ও সুষম বিন্যাসের ফলে চমৎকার একটি অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে। যেমন 'ঝড়' কবিতায় আবেগের মত্ততা ও কল্পনার সুদূর বিস্তার লক্ষণীয় ... ফলে কবিতায় উপমা-উৎপেক্ষা ও রূপকল্পে এসেছে এক অস্থির গতিশীল প্রবাহ স্থিরচিত্রের মত নিবদ্ধ না থেকে এসব কবিতায় রূপকল্প যেন এক অস্থির উদ্দাম বেগে ধায়।'[৫] শব্দের মাধ্যমে ঝড়ের উপলব্ধি নয়, ঝড়ের মত্ততা, আলোয়ান, ক্ষুব্ধতা ও গতি তিনি চমৎকারভাবে তুলে এনেছেন। তেমনি 'আগমনী' কবিতায় রয়েছে যুদ্ধের অপূর্ব বর্ণনা। কেবল যুদ্ধের দৃশ্যের পর দৃশ্য বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং দৃশ্যের মধ্যে তিনি তাঁর বিপ্লব চেতনার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। সমগ্র কবিতাটির চরণে চরণে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার চিত্রকল্পে এনেছে গতি ও উত্তেজনা। যেমন—

একি রণ বাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রণরণ রণ ঝনঝন।
সেকি দমকি দমকি
ধমকি ধমকি
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি

(আগমনী, অগ্নিবীণা)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল তাঁর কবিতায় নিজস্ব আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অসংখ্য শব্দচিত্র এঁকেছেন। তাঁর উচ্চ সুরের কবিতার ক্ষেত্রে বিষয় ও বক্তব্য বেশি আকর্ষণীয়। ফলে এসব কবিতার অন্তর্গত শিল্পরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না অনেক ক্ষেত্রে। 'আগমনী' কবিতাটিও তেমনি শব্দ-ছন্দ-ধ্বনি ঝংকারে এমন গতি সঞ্চার করে যে তা বিস্ময়কর। আবার দুর্যোগময় রাত্রির চিত্রকল্পে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে অবলম্বন করে নিয়ে 'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় নজরুল সৃষ্টি করেছেন শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমার অসাধারণ ব্যঞ্জনা। যেমন—

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়াপার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বণিল রে ঈশানে।

...

অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার হুঙ্কার তর্জন।

(খেয়াপারের তরণী, অগ্নিবীণা)

'কেয়ামত রাত্রির ভয়াবহতাকে দৃশ্যময় করার জন্য দৃশ্যরূপময় বা চিত্রধর্মী চিত্রকল্পের ব্যবহার অনির্বাণ হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে গম্ভীর নির্ঘোষ অনুপ্রাসের সাহায্যে।'[৬]

'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর' কবিতায় শ্রবণইন্দ্রিয় ব্যবহার করে নজরুল নির্মাণ করেছেন অসাধারণ একটি চিত্রকল্প। ব্রজপাতের শব্দকে মন্দিরের কাঁসার ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করে নজরুল চিত্রকল্পটিতে নিয়ে এসেছেন অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

বজ্রাঘাতে ঘন ঘন আকাশ কাঁসর ওঠে বাজি।

(দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর, সিন্ধু হিন্দোল)

কবিতাটির মূল বক্তব্য সত্য সুন্দর কল্যাণের জন্য যুব সমাজের বিদ্রোহ কাঁসর ধ্বনির প্রতীকে রূপময় হয়েছে উক্ত চিত্রকল্পটিতে। বজ্রাঘাত কাঁসর ধ্বনির উপমান এবং এর সঙ্গে মুক্তির জন্য, কল্যাণের জন্য তারুণ্যের অভিযান ও বিদ্রোহ চমৎকারভাবে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট' কাব্যেও এরূপ একটি চিত্রকল্প পাওয়া যায়।

"সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর ফোলা সিংহ।"

(৩ নং কবিতা, পত্রপুট)

রবীন্দ্রনাথ চিত্রকল্পের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তাঁর কল্পনার জগৎ থেকে কিন্তু নজরুল ইসলামের কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা এবং উৎস উভয়ই বাস্তব পৃথিবী। এ কারণেই দুই কবির চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও বর্ণনাগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বিষয় ও উপমান উৎস ভিন্ন, চেতনাও ভিন্ন।

'মরণ-বরণ' কবিতায় রয়েছে শ্রুতিনির্ভর একটি অসাধারণ চিত্রকল্প। আগুনের শিখার মধ্যে হাসির ধ্বনি সংযুক্ত করে দীপক রাগে জীবন বাঁশি বাজাবার যে মিশ্র ও অভিনব চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা তুলনারহিত।

দীপক রাগে বাজাও জীবন বাঁশী
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি।

(মরণ-বরণ, বিষের বাঁশী)

নিষ্প্রাণ মরার মুখে হাসি ফুটে উঠবে যা আগুনের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করার তীব্রতা সংযুক্ত,

Dhaka University Institutional Repository

নাকি মরার মুখে আগুন জ্বলে উঠবে যা হাসির ধ্বনির মতো উচ্চকিত অথবা কোমল। চিত্রকল্পটিতে নজরুলের যে শিল্পরসের পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁর নিজস্ব।

কান্নার ধ্বনি নজরুলের অপর একটি শ্রুতিনির্ভর অনুষঙ্গ। 'মোহররম' কবিতায় ক্রন্দনের ধ্বনি ও দৃশ্য বারবার চিত্রকল্পে পরিণত হয়ে কারবালার বেদনা ও বিষাদকে ধ্বনি ও দৃশ্যময় করে তুলেছে। মোহররম ও কারবালার বেদনার কাহিনী নিয়ে রচিত বেশ কয়েকটি গানের মধ্যেও নজরুল ধ্বনি ও দৃশ্যপ্রধান চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন।[৭] উল্লেখ্য শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প নির্মাণের দৃশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধ্বনির বিষয়টিই সেখানে প্রধান। যেমন—

১. কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।
রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া দামেশকে—
(মোহররম, অগ্নিবীণা)

২. ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান, ইসরাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু! গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষাণো বাজ।
(ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দমে, বিষের বাঁশী।)

৩. বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙ্গে যায় কেঁপে কেঁপে
নাড়ী-ছেঁড়া একি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে ব্যেপে
(ঐ)

কারবালার প্রান্তরে ঘাতক সীমারের ছোরাতে নিহত হোসেনের শোকে অশ্রুর আভাস যেমন অভিনব চিত্রকল্প তেমনি তার সঙ্গে ক্রন্দনের ধ্বনির 'মাতম' শ্রুতিনির্ভর অপূর্ব একটি চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে মহানবী (সঃ) এর মৃত্যুতে শোকে কাতর চারদিক। মহাধ্বংসের সূচনাকারী ইসরাফিলের প্রলয় বিষাণ ও গুমরিয়ে কাঁদে। তৃতীয় উদ্ধৃতিও হযরত মোহাম্মদের মৃত্যুতে তাঁর প্রিয় শিষ্য বেলালের হৃদয় ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা ক্রন্দনের বেগে আজানের স্বর কেঁপে যাওয়ার করুণ এবং অসাধারণ চিত্রকল্পে রূপান্তরিত হয়েছে।

চিত্রকল্প সৃষ্টিতে নজরুল বেদনাভরা করুণমাখা কবিতাতেই অধিকতর চমৎকারিত্ব এনেছেন। নজরুলের প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় এই পারদর্শিতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। কেবল প্রকৃতির রূপ বর্ণনার মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। এ জাতীয় কবিতায় তিনি হৃদয়ানুভূতির গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও তাঁর সেই হৃদয়ানুভূতির তীব্র প্রকাশ লক্ষণীয়। যেমন প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতায় ক্রন্দনের শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প—

১. গাইতে বসে কণ্ঠ ছিঁড়ে আসবে যখন কান্না,
বলবে সবাই—সেই যে পথিক তার শেখানো গান না?
...
ফুটবে আবার দোলন-চাঁপা চৈতী রাতের চাঁদনী
আকাশ-ছাওয়া তারায় তারায় বাজবে আমার কাঁদনী
(অভিশাপ, দোলনচাঁপা)

২. পুবের হাওয়ার কাঁদবে সে সুর, আসবে পছিম হাওয়ার সাল।
সেই আশাতে জাগব রাত।
(আশান্বিতা, ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

৩. নিত্য চেনার বিত্ত বাজে চিত্ত আরাধনে,
পুণ্য সে ঘর শূন্য এখন কাঁদছে নিরজনে।।
(পিছুডাক, ঐ)

৪. বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারায় ভয়ে।
(শেষের গান, ছায়ানট)

৫. খুঁজে বেড়াই কোন আস্তনে কাঁকন বাজে গো
বেরিয়ে দেখি ছুটছে কেঁদে বাদলী হাওয়া হু হু।
(নিরুদ্দেশের যাত্রী, ঐ)

৬. খুশির পাপিয়া পিউ পিউ গাহে দিগ্বিদিক,
বধূ জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিমিখ্।
কোথা ফুলদানি, কাঁদিছে ফুল
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জির)

৭. এপারে ওপারে জনম জনম বাধা
অকূলে চাহিয়া কাঁদিছে কূলের রাধা।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি,
কাঁদিছে বাঁশরি সুরের ছলনা করি।
আমরা শুনাই সেই বাঁশরির সুর
কাঁদি-সাথে কাঁদে নিখিল ব্যথা-বিধুর।
(চক্রবাক, চক্রবাক)

প্রকৃতির বিচিত্র উপকরণ নজরুল ইসলাম শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির এইসব উপকরণ রাশির সঙ্গে ক্রন্দনধ্বনির বিভিন্নভাবে প্রকাশের ফলে চিত্রকল্পগুলিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি চিত্রকল্পই আলাদাভাবে গভীর অভিনিবেশসহ লক্ষ্য করার দাবি রাখে। গভীর অন্ধকার রাতের আকাশের তারায় কবির হৃদয়ের বিরহ বেদনা ক্রন্দনের ধ্বনিতে বেজে উঠবে। অথবা বিপুল ঐশ্বর্যের মাঝে কবির শূন্য হৃদয়ের কান্না অভিনব। বনের আঁধার কেঁদে লুটিয়ে পড়ার মাধ্যমে বিমূর্ত বিষয়ের মধ্যে কবি দৃশ্য ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেছেন। ক্রন্দন ধ্বনিতে ভীত হরিণের হারিয়ে যাওয়া কবির বিরহতপ্ত হৃদয়ের প্রতিরূপ। এভাবেই প্রতিটি চিত্রকল্পেই কান্নার যে করুণ সুর ধ্বনিত তারই সাথে কবির মন আকুল হয়ে কেঁদে চলেছে। রাবীন্দ্রিক চিত্রকল্পে শ্রুতিনির্ভরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রন্দনের বিচিত্র উপস্থিতি রয়েছে তাঁর কবিতায়। যেমন—

হাঁড়ি চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।
(ছেলেটা, পুনশ্চ)

ধ্বনি এখানে বিচিত্রভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য। ক্রন্দনের ধ্বনি যান্ত্রিক শব্দে একাকার।[৮] নজরুল ক্রন্দনের ধ্বনিকে বাঁশি বাতাস অথবা কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে সমন্বিত করে দিয়েছেন।

ক্রন্দনের ধ্বনি সমসাময়িক জীবনানন্দ দাশ, অথবা বুদ্ধদেব বসুর কবিতাতেও পাওয়া যায়। জীবনানন্দ দাশ কান্নার সূক্ষ্মতম ধ্বনির চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'এই ধ্বনি চেতনা ব্যথার স্মৃতি তুলে ধরে, বেদনার বাণীতে তাঁকে আবিষ্ট করেছে। তাঁর পাখিরা গান গায় না, কাঁদে—'শজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে নিম্‌নিম্ কার্তিকের চাঁদে।' (রূপসী বাংলার সনেট নং ২০) আর চিলের ডাক এক আশ্চর্য প্রতিবেশ রচনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হায়! চিল সোনালী ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাক উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে—
(হায় চিল, বনলতা সেন)

প্রত্যাহত সৌন্দর্যের বেদনার বাণীই চিলের কান্না, কান্নার সুরে মিলেমিশে কবির মন কেঁদে চলেছে'[৯] অথবা

'তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।'
(হায় চিল, বনলতা সেন)

শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টিতে নজরুল ইসলাম বস্তুগত উপকরণ যেমন—শখ, নূপুর, চুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এসব বস্তুগত উপকরণ মালার সাথে কখনও যুক্ত হয়েছে ক্রন্দনের কখনও হাসির শব্দ। এই ধ্বনিসমূহ কখনও কবির মনের গভীর বেদনাকে জাগিয়ে তোলে, কখনও প্রকাশ করে আনন্দ। যেমন—

আনো তোমার বরণ-ডালা আনো তোমার শঙ্খ নারী
ঐ দ্বারে মার মুক্তি সেনা, বিজয় বাজা উঠছে তারি।
(বিজয় গান, বিষের বাঁশী)

বিজয়ের উৎসব ও আনন্দে মেয়েদের শঙ্খ বাজাবার ভারতীয় রীতিকে নজরুল কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। বিভাগের আনন্দে শঙ্খের ধ্বনি শ্রুতিনির্ভর বাক্‌প্রতিমার সৃষ্টি করেছে। আবার নূপুরের ধ্বনির আহ্বান কবিকে করেছে উদাসীন।

সে যে পথের চিরপথিক, তার কি সহে ঘরের মায়া?
দূর হতে মা দূরান্তরে ডাকে তাকে পথের ছায়া।
মাঠের পারে বনের মাঝে
চপল তাহার নূপুর বাজে,
(অবেলার ডাক, দোলন-চাঁপা)

পায়ের নূপুর বেঁধে পথে-পথে মাঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ানোর সঙ্গে বাউলদের সাদৃশ্য রয়েছে। পথের ছায়া সে পথের চির পথিককে ডাকে তিনি কবি নিজে। যিনি বাউলের বেশে তাঁর অধরার সন্ধান করেন। উদাসী বাউলের এই কল্পচিত্রের সঙ্গে নূপুরের ধ্বনি শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছে। চুড়ির শব্দ কবি চেতনায় জাগিয়ে তুলেছে প্রেমের আকুতি। যেমন—

রেশমি চুড়ির শিঞ্জীনীতে রিমঝিমিয়ে মরম কথা
পথের মাঝে চমকে কে গো থমকে যায় ঐ শরম-লতা।।
(পাপড়ি খোলা, ছায়ানট)

চুড়ির ধ্বনি মাধুর্য যেমন কবির হৃদয়ে প্রণয়ের কামনা জাগিয়েছে তেমনি প্রেমের স্মৃতিতে কবিকে আকুল করেছে 'শীতের সিন্ধু' কবিতায়। মেঘ, জল, চুড়ির ব্যবহারে সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব শব্দমাধুর্য।

সেদিন শ্রাবণে
ছলছল জল-চুড়ি-বলয়ে-কঙ্কনে
শুনিয়াছি যে-সঙ্গীত, যার তালে তালে
নেচেছে বিজলী মেঘে, শিখা নীপ-ডালে।

Dhaka University Institutional Repository

...
রোয়ে রোয়ে বহে না'ক পূবালী বাতাস,
শ্বসে না ঝউয়ের শাখে সেই দীর্ঘশ্বাস,
(শীতের সিন্ধু, চক্রবাক)

প্রথম পর্যায়ের মিলনের চিত্র থাকলেও মূলত মিলনের এই স্মৃতি কবিকে বিরহ কাতর করে তুলেছে। 'জল চুড়ি বলয় কঙ্কনের' ধ্বনি কবির স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাঁকে বিরহী করেছে। জল-চুড়ির ধ্বনির সঙ্গে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এবং আবেগ মিলে চিত্রকল্পটিকে অপূর্বত্ব দান করেছে। অপর একটি চিত্রকল্পে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে—

দীঘল শ্বাসের বাউল বাজে নাসার সে তার সোড় বাঁশীতে
পান্না-ক্ষরা কান্না যেন ঠোঁট-চাপা তার চোর হাসি সে।
(মানস-বধূ, ছায়ানট)

এখানেও নজরুল ইসলাম বাউলের উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সাথে কবির প্রেমিকার কান্না হাসির দ্বৈত অনুভূতি সৃষ্টি করে। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বাউলের বাঁশির ধ্বনি মূলত কবির বিরহবেদনা জাগিয়ে দিয়েছে। নজরুলের কবিতায় একই সঙ্গে দ্বৈত অনুভূতির সৃষ্টি করে এমন উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। 'ঈদ মোবারক' কবিতায় পাখির ডাকের আনন্দ ধ্বনির সঙ্গে ফুলের ক্রন্দনের একটি বিমূর্ত বিষয়কে সংযোজন করেছেন।

খুশির পাপিয়া পিউ-পিউ গাহে দিগ্বিদিক,
বধূ জাগে আজ নিশীথ-বাসরে নির্নিমিখ।
কোথা ফুলদানি, কাঁদিছে ফুল।
(ঈদ মোবারক, জিঞ্জীর)

'মাধবী-প্রলাপ' কবিতাতে নজরুলের বিরহ বোধের ভিন্নমাত্রার একটি চিত্রকল্প পাওয়া যায়। পাখির ডাকের মিষ্টি মধুর সুরের মধ্যে কবি সংযুক্ত করেছেন ভয়ঙ্কর চিত্রকল্প।

সখি মদনের বান হানা শব্দ শুনিস
ঐ বিষমাখা মিশ্-কালো দোয়েলের শিস।
(মাধবী প্রলাপ-সিন্ধু হিন্দোল)

দোয়েলের শিসের চমৎকার ধ্বনি মাধুর্যে মিশিয়ে দিয়েছেন ভয়ানক কালো রঙ এবং লিপ্ত করেছেন বিষ। ফলে দোয়েলের শিসের ধ্বনি সৌন্দর্য একটি ভীতিকর উপলব্ধি সঞ্চার করে। আবার শিসের ধ্বনির আকারহীনতায় রঙ ও বিষ—এই বস্তুগত উপকরণ সংযোজনের ফলে একটি অপূর্ব ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রকল্প নির্মাণে সমসাময়িক অপরাপর কবিদের থেকে নজরুলের ভিন্নতা সহজেই অনুমান করা যায়। শ্রুতিনির্ভর চিত্রকল্পের সংখ্যাও তাঁর কবিতায় কম নয়। প্রতিটি চিত্রকল্পের মধ্যেই কবির হৃদয়ের উপলব্ধি কাজ করেছে। ফলে চিত্রকল্পগুলি জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১. *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ।
২. *নজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার : আবেগ উদ্দীপনার অনুষঙ্গ*, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *নজরুল সমীক্ষণ*—মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সম্পাদক, নজরুল ইনস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ৩২৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩. *নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার*, রফিকুল ইসলাম, সাহিত্য পত্রিকা, অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১১।

৪. ঐ

৫. *নজরুল কবিতায় চিত্রকল্প*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, *নজরুল ইসলাম : কবিমানস ও কবিতা*, নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৬০।

৬. *নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার*, রফিকুল ইসলাম, ঐ পৃ, ২।

৭. ঐ

৮. *রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প*, সিদ্দিকা মাহমুদা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১, মুক্তধারা, পৃ. ৫৮।

৯. *কবিতায় চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, শ্যামল কুমার ঘোষ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে স্বাদনির্ভর বাক্‌প্রতিমা

অন্যান্য ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পের মতো স্বাদনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও নজরুলের কৃতিত্ব অসামান্য। যদিও স্বাদনির্ভর চিত্রকল্পের সংখ্যা তুলনায় কম। তবুও এই অল্পসংখ্যক চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে নজরুলের কবি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নজরুলের স্বাদনির্ভর বাক্‌প্রতিমা কেবল রসনার পরিতৃপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং রসনার উপলব্ধি পেরিয়ে জীবনের রূপ-রস গন্ধের গভীরতম অনুভূতির কথা এগুলিতে ফুটে উঠেছে। আবার কখনো ফুটে উঠেছে একান্তই শরীরি চেতনার প্রকাশ কখনো প্রেম এবং বিরহ। আর স্বাদনির্ভর বাক্‌প্রতিমার উপকরণগুলো নজরুল তুলে এনেছেন প্রকৃতির ফল-ফসল থেকে শুরু করে অশ্রু এবং সুরা পর্যন্ত। এছাড়া বিমূর্ত কল্পনার প্রসারণও এ পর্বের বাক্‌প্রতিমাতে পাওয়া যায়।

স্বাদনির্ভর বাক্‌প্রতিমাগুলির সঙ্গে কখনও কখনও অন্যান্য ইন্দ্রিয়চেতনার মিশ্রণ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। এগুলিকে মিশ্র ইন্দ্রিয়চেতনার বাক্‌প্রতিমা হিসেবে আলোচনার অবকাশ থাকলেও এক্ষেত্রে মিশ্র ইন্দ্রিয়চেতনার প্রকাশও কোন কোন উদাহরণে লক্ষণীয়। তা মূলত স্বাদ-ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্যের কারণে এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত।

নজরুলের কবি স্বভাবের যে মূল প্রবণতা বিদ্রোহচেতনা—তিনি এই বিদ্রোহের প্রকাশে সংযোজন করেছেন বিচিত্র সব চিত্রকল্প। স্বাদনির্ভর চিত্রকল্পও এক্ষেত্রে একেবারে দুর্লভ নয়। যেমন—

আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির
(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

শিবকে কেন্দ্র করে নজরুলের যে ধ্বংস এবং সৃষ্টির দ্বৈতসত্তা তারই এক চমৎকার উপস্থাপনা এই উদাহরণটি। বিষপানে নীলকণ্ঠ শিবের বিরহ ব্যথার মাধ্যমে স্বাদনির্ভর চিত্রকল্পে নজরুল উপস্থাপনা করেছেন তাঁর কবিচেতনা। আবার কবি হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহের চরম প্রকাশ ঘটেছে এভাবে—

আমি আপনার বিষ-জ্বালা মদ পিয়া মোচড় খাইয়া খাইয়া
জোর বুঁদ হয়ে আমি চলেছি ধাইয়া ভাইয়া।
(ধূমকেতু, ঐ)

সমাজ রাষ্ট্রে যে অনাচার, অত্যাচার, পরাধীন জাতির যে নিষ্পেষিত করুণ পরিণতি তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কবি তাঁর চেতনার জ্বালা-যন্ত্রণা বিষাক্ত মদের মতো পান করে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কামনা একটি বিমূর্ত ভাবনা—যাতে নজরুল বস্তুর সত্তা আরোপ করে পান করেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির কামনা একটি বিমূর্ত ভাবনা—যাতে নজরুল বস্তুর সত্তা আরোপ করে পান করেছেন। নির্বস্তক উপাদানে কবি বস্তুগত চেতনা আরোপের দ্বারা তা পানযোগ্য করে তোলার ফলে স্বাদইন্দ্রিয়ের ব্যবহার নতুন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। অপর একটি স্বাদনির্ভর বাক্‌প্রতিমা—

কচি শিশু রসনায় ধানী-লঙ্কার পোড়া ঝাল
আর বদ্ধকারায় গন্ধক ঘোঁয়া, এসিড, পটাস, মোনছাল
আর কাঁচা কলিজায় পচা ঘা'র সম সৃষ্টিরে আমি দাহ করি
আর স্রষ্টারে আমি চুষে খাই।
(ধূমকেতু, অগ্নিবীণা)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিটিতে পোড়ামরিচ এবং বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য তীব্র ঘ্রাণ জাগিয়ে তুললেও প্রথম চরণে

Dhaka University Institutional Repository

শিশুর রসনায় মরিচ যে জ্বালার সূচনা করে কবির চেতনায় সূচিত হয়েছে বিদ্রোহের সেই উত্তাপ ও জ্বালা। এবং শেষ চরণে স্রষ্টাকে চোষ্য উপযোগী মুখরোচক খাদ্যে পরিণত করার মধ্য দিয়ে কবি মূলত বিশ্ববিধাতারূপী অত্যাচারী শাসকচক্রের অটল আসনকে ধ্বংস করতে চেয়েছেন। প্রথম চরণে একটি বস্তুগত স্বাদ ইন্দ্রিয় এবং শেষ চরণে একটি অদৃশ্য বিমূর্ত বিষয়কে বস্তুমূল্য দান করে স্বাদ ইন্দ্রিয়ের প্রসারণে নজরুলের চিত্রকল্প নির্মাণের প্রতিভা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বাদ ইন্দ্রিয়নির্ভর বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে নজরুল ইসলাম প্রেমের কবিতায় অসাধারণ বৈচিত্র্য সন্ধানী। তাঁর কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রেমকে তিনি শরীরি করে তুলেছেন। সেখানে প্রেমের প্রাপ্তিটাই মুখ্য। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষায় অপ্রাপ্তি অর্থাৎ বিরহ চেতনার শাশ্বত স্বরূপের সন্ধানে নজরুল নির্মাণ করেছেন প্রেমের সৌধ। এ কারণে স্বাদনির্ভরতা একটি শরীরি উপস্থাপনার বিষয় হলেও শেষ পর্যায়ের কবিতায় তা আর কেবল ইন্দ্রিয়জ কামনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমর্পিত হয়েছে, অতিইন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে। যেমন—

১. পাংশু তাহার চূর্ণ কেশে,
মুখ মুছে যায় সন্ধ্যে এসে,
বিধুর-সাধু যেন নিঙড়ে কাঁচা আঙুর চোয়ায়।।
(মানস-বধূ, ছায়ানট)

২. আনার লাল লাল
দানার তার গাল
তিলের দাগ তায় ভোমর;
কপোল-কোল্ ছায়
চপল টোল, তায়
নীলের রাগ ভয়ে চুমোয়।।
(প্রিয়ার রূপ, ছায়ানট)

৩. আমার হেলায় হত্যা করে দাঁড়িয়ে আমার রক্ত বুকে
অধর-আঙুর নিঙড়েছিলে সখার তৃষা শুষ্ক মুখে।
(আলতা-স্মৃতি, ছায়ানট)

স্বাদ-ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে এভাবে নজরুল ফলের উপমান চিত্র ব্যবহার করেছেন। আঙুর আনার ইত্যাদি তাঁর মানসপ্রিয়ার রূপের অনুষঙ্গ। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলির প্রথমটিতে নজরুল প্রেমিকার অপূর্ব রূপের বর্ণনায় অধর নিঙড়ে যখন কাঁচা আঙুরের নির্যাস নির্গমন করেন তখন ভয়াবহভাবে আমাদের মধ্যে স্বাদ গ্রহণের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। তৃতীয় সংখ্যক উদাহরণটিতেও প্রকটভাবে একই চিত্রকল্প নবতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত। বরং এখানে তৃষিত প্রেমিকের শুদ্ধ শুষ্ক মুখে আঙুর রূপ অধর নিঙড়ে দেওয়ার মধ্যে উপস্থিত হয়েছে তীব্র শরীরি কামনা। প্রেমের উগ্রবাসনায় ইন্দ্রিয় স্বাদের এক অসাধারণ চিত্রকল্প নির্মাণে নজরুল প্রবলভাবে সার্থক। দ্বিতীয় সংখ্যক উদ্ধৃতিটিতে ডালিমের লাল দানার সঙ্গে তুলনীয় প্রেমিকার গাল চুম্বনের দ্বারা মূলত স্বাদ আস্বাদিত হয়ে ওঠে। নজরুলের আরেকটি চিত্রকল্পে—

পেয়ালার হেথা শহিদী খুন
তলোয়ার-চোঁয়া তাজা তরুণ
আঙ্গুর-হৃদি চুয়ানো গো
গেলাসে শারাব রাঙা অরুণ।
(আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়, জিঞ্জীর)

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ এবং কবি হৃদয়ের মিলনকামনা স্বাদনির্ভর চিত্রকল্পে অসাধারণত্ব লাভ করেছে। ফুলের ব্যবহার ঘ্রাণনির্ভর এবং দৃষ্টিনির্ভর চিত্রকল্পে আমরা পেয়েছি। বাদল রাতের পাখি কবিতায় পুষ্পকুমারী পুষ্পমধুর আস্বাদানে জাগ্রত করে ইন্দ্রিয়জ কামনার অপূর্ব রূপ।

মুকুলি পুষ্পকুমারীর ঠোঁটে ভরে পুষ্পল মধু

(বাদল রাতের পাখি, চক্রবাক)

স্বাদ ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রেমের অপূর্ব আর একটি চিত্রকল্প 'দহন-মালা' কবিতায় পাওয়া যায়। কবি তাঁর প্রেমিকার নীল নয়নের সৌন্দর্য পান করেছেন। কিন্তু তা কবিকে দিয়েছে বিষের যন্ত্রণা। কেননা কবির প্রিয়া ততদিনে কবিকে দিয়েছে প্রত্যাখ্যানের জ্বালা।

বনের হরিণ বাঁধবে বৃথা লক্ষ্মী গহণ-বালা।
কল্যাণী! হায় কেমনে তোমায়
দেবো যে বিষ পান করেছি নীলের নয়ন- গালা।।

(দহন-মালা, ছায়ানট)

কিন্তু এই বিরহ ক্ষণিকের। অভিমানজনিত এই বিরহ শাশ্বত নয়। এই পর্বের কবিতায় বিরহচেতনা মূলত কবির মিলন আকাঙ্ক্ষার এবং মিলনের সার্থকতার মধ্যে নিহিত কবিসত্তার বহিঃপ্রকাশ। প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত বিরহচেতনার প্রকাশ লক্ষণীয় শেষ পর্বের কবিতাসমূহতে। 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট', বা 'পূর্বের হাওয়া' কাব্যে প্রেমে মিলনের যে আকুতি চক্রবাক কাব্যে এসে মিলনের সেই আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্তির মধ্যে সার্থকতা সন্ধান করে। 'কর্ণফুলী' কবিতায় কর্ণফুলী নদীর রূপক কবির প্রিয়া। নদী সতত বহমান। পাহাড়ের হাড় গলা আঁখি জল নিয়ে কর্ণফুলী সকলের সব নিবেদন উপেক্ষা করে ছুটে চলে। মাঝিরূপী প্রেমিক কবি প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনায় তাই নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে—

ওগো ও কর্ণফুলী
উজাড় করিয়া দিনু তব জলে আমার অশ্রুগুলি।
যে লোনা জলের সিন্ধু-সিকতে নিতি তব আনোগোনা,
আমার অশ্রু লাগিবে না সখি তার চেয়ে বেশি লোনা!

(কর্ণফুলী, চক্রবাক)

হৃদয় উৎসারিত অশ্রুজল লোনা স্বাদে জাগিয়ে তুলেছে কবির বিরহবোধের তীব্র আবেগ। 'মিলন মোহনায়' কবিতাতেও পাওয়া যায় প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা যন্ত্রণার হাহাকার।

যার তরে কাঁদি—ধার করে তারি জোয়ারের লোনা জল
তোর মত মোর জাগে নারে কভু সাধের কাঁদন ছল।

(মিলন মোহনায়, চক্রবাক)

বিরহ ব্যথার ক্রন্দন জোয়ারের লোনা জলের মতো কবিকে আকুল করে তুলেছে। দুটি উদ্ধৃতিতেই 'লোনা' শব্দটি এনে দেয় স্বাদইন্দ্রিয়ের উপযুক্ততা।

'পাপ' কবিতার একটি চিত্রকল্পের সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় ইংরেজ কবি কিটস্ এবং জীবনানন্দ দাশের 'অবসরের গান' কবিতার। যদিও কিটস্ এবং জীবনানন্দ দাশের কবিতার বিষয় এবং বিন্যাসের সঙ্গে নজরুলের এই কবিতার বিষয়ের এবং বিন্যাসের সাদৃশ্য নেই। তবু অপূর্বভাবে মিলে এই চিত্রকল্পটি—

প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ-পুষ্প-পুটে।

(পাপ, সাম্যবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

পাপ-পূণ্য বিষয়ে ধর্মীয় আবেগ প্রকাশিত হয়েছে নজরুলের এই কবিতায়। কিন্তু জীবনানন্দ দাশের 'অবসরের গান' কবিতাটিতে জীবনের এক ইন্দ্রিয়ঘন (sensuous) রূপমাধুরী কবিতাটির ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠেছে। কবিতাটির মর্মে রয়েছে নিঃশেষিত 'জীবন ভাড়ার'-এর বিষণ্ন বিষাদের বাণী। ফলন্ত ধানের রসে ভরা জীবন ভাঁড়ার একদিন স্বাদে ভরে দিয়েছিল আমাদের সকলের দেহ, আজ তা নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে—এই ব্যথার বাণী বুকে বহন করেও 'দিব্য স্বপ্ন' এর দু'একটা মুহূর্তের ছবি সঞ্চিত ছিল সৌভাগ্যের মুহূর্তে কবি তা আস্বাদন করেছেন। বাস্তবে নয়, কল্পনার পানপাত্রে। ইংরেজ কবি কিটস্ যেমন প্রোসির ডানায় করে সৌন্দর্যলোকে প্রয়াণপ্রয়াসী জীবনানন্দকেও তাই করতে হয়েছে। কিটস্ এর মতন করেই মদিরার সাহায্য খুঁজেছিলেন কবি—

'অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে লব তার শীতলতা;[১]

মোহিতলাল মজুমদারের 'অঘোর-পন্থী' কবিতায় রয়েছে একইরূপ একটি চিত্রকল্প। মৃত্যুকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করেছেন কবি এ কবিতায় এবং গ্রহণ করেছেন জীবনের সুধা—

যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হয়ে যাক্ হিতাহিত জ্ঞান।

(অঘোর-পন্থী)[২]

নজরুল ইসলাম বারবার নিজেকে বলেছেন লক্ষীছাড়া। ব্যক্তিজীবনে আজন্ম উদাসীন। তাই গৃহহীন পথের মানুষদের তিনি সহজে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। 'লক্ষীছাড়া' কবিতায় রয়েছে তাঁর সেই উদাসীন কবিসত্তার পরিচয়। যদিও তাঁর এই উদাসীনতা আর গৃহহীন বৈরাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর প্রেমিকসত্তার অতৃপ্ত আত্মা।

পরবাসীদের পথের ব্যথা স্মরি;
তাই ত তারা এই উপোসীর ওষ্ঠে ধরে ক্ষীরের থালা
শান্তি বারি-ধারা।

(লক্ষীছাড়া, ছায়ানট)

পলকেই তিনি মনে করেছেন গৃহহীন উপোসী নিরাশ্রয়ের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। পথই দূর করে পথের ক্লান্তি। এই অংশে উপবাসী নিরাশ্রয় কবির পথের ক্লান্তি ব্যথা স্মরণ করে সঙ্গীহীন নির্জন পথ তাঁর ওষ্ঠে তুলে ধরেছে ক্ষীরের পাত্র। যা কবির স্বাদ ইন্দ্রিয়ে এনে দিয়েছে শান্তির পরশ।

স্বল্পসংখ্যক হলেও স্বাদ ইন্দ্রিয়নির্ভর কতিপয় চিত্রকল্পের মধ্য দিয়েই নজরুল চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর পারদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

তথ্যসূত্র

১. *কবিতার চিত্রকল্প : কবি জীবনানন্দ দাশ*, শ্যামলকুমার ঘোষ, কলকাতা ১৩৯৪, পৃ. ২০৯।
২. *মোহিতলাল মজুমদারের নির্বাচিত কবিতা*, সম্পাদনা, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে ত্বক বা স্পর্শনির্ভর বাক্‌প্রতিমা

স্পর্শ ইন্দ্রিয়নির্ভরতার সঙ্গে শরীরি চেতনার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় যেমন শরীর চেতনার তীব্র উপস্থিতি লক্ষণীয়, তেমনি নজরুলের কবিতার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে দেহজ। কবিতায় চিত্রকল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রয়োজনেই তিনি শরীরি চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই সূত্রেই নজরুলের কবিতায় শরীর চেতনা বা স্পর্শানুভূতি একটি-অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[১]

স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে চিত্রকল্প সৃষ্টিতে নজরুলের একটি বিশেষ সাফল্যও লক্ষণীয়। সমসাময়িক অনেকের কাব্যভাবনায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রেমের আয়োজনটাই বড়, যেখানে শরীরি চেতনা মুখ্য হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রম জীবনানন্দ দাশ এবং নজরুল ইসলাম। জীবনানন্দ দাশে প্রকৃতির নিবিড় উপস্থাপনায় শরীরি চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আর নজরুলের কবিতায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রসারণ শরীরি প্রকৃতি ছাড়িয়ে তাঁর বিদ্রোহী চেতনাকেও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আবার তাঁর বিদ্রোহ এবং প্রেম যখন একই ধারায় প্রবাহমান-স্বদেশের মুক্তি এবং কবির ব্যক্তি পুরুষের শৃঙ্খলা মুক্তি চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যময় প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনায়, নজরুল স্পর্শনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন দুটি চেতনার যৌথ সমীকরণে।

নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে স্পর্শেন্দ্রিয় নির্ভর বাক্‌প্রতিমা নির্মাণ করেছেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় যেমন তেমনি অন্যান্য সংগ্রাম ও সাম্যবাদের চেতনায় উজ্জীবিত কবিতাসমূহে নজরুল নির্ভরতার এক আশ্চর্য স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের কবিতাগুচ্ছ স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে নজরুল অনিবার্যভাবেই ব্যবহার করেছেন পৌরাণিক উৎস। সমকালীন সমাজ বাস্তবতা ইংরেজি শাসিত পরাধীন জাতির বন্দিত্ব মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল কবি কেবল রাজনীতি সচেতন ছিলেন তাই নয়, বরং চিত্রকল্প সৃষ্টির সাফল্য প্রমাণ করে যে তিনি শিল্প সচেতনও ছিলেন। স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে সমকালীন অপরাপর কবিগোষ্ঠী যখন কেবল প্রেমের কল্পনায় দেহজ চেতনার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন তখন নজরুল সার্থক শিল্প অভিপ্রায়ে, বিদ্রোহী চেতনায় সেই কবি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'অগ্নিবীণা' কাব্যের দৃষ্টান্তসমূহ—

১. দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার এস্ত জটায়।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

২. দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

৩. করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

৪. আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল।
(ঐ)

৫. আমি আফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম্ ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম।
(ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

৬. আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন;
(ঐ)

৭. সিথির সিঁদুর মুছে ফেল মা গো,
জ্বাল সেথা জ্বাল কাল-চিতা,
(রক্তাম্বরধারিণী মা, ঐ)

৮. টুঁটি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
(ঐ)

৯. মহামাতা ঐ সিংহ বাহিনী জানায় আজিকে বিশ্ববাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিসে যায় শির পশুর।
(আগমনী, ঐ)

১০. আমি স্রষ্টার বুকে সৃষ্টি পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার—
আর মর্ত্যে সাহারা-গোবী-ছাপ
আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ।
(ধূমকেতু, ঐ)

১১. ঘুর পাক্ খাই, ধাই পাঁই পাঁই,
মম পুচ্ছে জড়ায়ে সৃষ্টি
করি উল্কা-অশনি বৃষ্টি,—
(ধূমকেতু, ঐ)

১২. মহা-সিংহাসনে সে কাঁপিছে বিশ্ব সম্রাট নিরবধি
তার ললাটে তপ্ত অভিশাপ-ছাপ এঁকে দিই আমি যদি।
(ঐ)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে নজরুলের চিত্রকল্প সৃষ্টির এক অসাধারণ ক্ষমতার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। যদিও কোনো কোনো উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে স্পর্শেন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃশ্য ইন্দ্রিয় অথবা স্বাদেন্দ্রিয়ের ক্ষীণ সংযোগ লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে বলা চলে—বস্তুজগতের সমস্তই দৃশ্যেন্দ্রিয়নির্ভর। এই দৃশ্যগ্রাহ্য বস্তুই মূলত বিচিত্র ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণময়তা এবং আবেগ সংশ্লিষ্ট হয়ে চিত্রকল্পের অপূর্বত্ব লাভ করে। এ কারণে 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার দুটি উদ্ধৃতিতেই পিঙ্গল রঙের এস্ত জটাধারী শিবের ভয়ঙ্কর রূপের দ্বারা যে দৃশ্যেন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টি হয়েছে সেখানে কবি কল্পনার 'দিগন্তরের কাঁদন' এই শ্রুতিময়তার বিমূর্ত বিষয়টির সঙ্গে লুটিয়ে পড়া স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর আবেগ যুক্ত হয়েছে। ফলে লুটায় শব্দটি উদ্ধৃতি দুটিতে স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পের অনির্বাণ লাভ করে।

অপরাপর উদ্ধৃতিগুলিতেও 'নালাগলি', ছিঁড়ি 'ঘুমচুমু', 'একে দিই পদচিহ্ন', 'মুছে', 'টিপে', 'পিষে', 'ছাপ' ইত্যাদি শব্দসমূহ স্পর্শের তীব্রতাকে প্রকাশ করে। সিথির সিঁদুর মুছে কাল চিতা জ্বালবার মাধ্যমে কবি আমাদের প্রথাগত পরিচিত আবেগকে ভেঙে ফেলে চিতাকে কাল বর্ণের এক অনির্দেশ ভয়াবহতা দান করেছেন। হিন্দু নারীর গৃহ জীবনের শান্তি ও প্রীতির প্রতীক সিঁদুর মুছে সে কাল চিতা জ্বালবে তা ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে। 'মুছে' ফেলবার মাধ্যমে এই উদাহরণে স্পর্শেন্দ্রিয়ের চমৎকার ব্যবহার সৃষ্টি করেছে নতুন একটি মাত্রা। অন্যান্য উদাহরণেও দৃশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে স্পর্শ অনুভূতি। এই স্পর্শ কোমল বা শিহরণ জাগানোর মতো নয়, বরং তা তীব্র প্রচণ্ড গতিশীল।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের বিদ্রোহ এবং প্রেম পরস্পর পরিপূরক। কাব্যচর্চার প্রাথমিক পর্যায়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির অহংবোধ, পরাধীন ব্যক্তিসত্তা ও জাতিসত্তার শৃঙ্খল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রেমের কামনা সমান্তরাল একটি ধারায় প্রবাহমান। বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশে যেমন তেমনি এই কবিতায় প্রেমাকাঙ্ক্ষাতেও নজরুল স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১. আমি ইন্দ্রানী সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ- তূর্য
(বিদ্রোহী-অগ্নিবীণা)

২. আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিশ্চিত
চিত-চুম্বন চোর কল্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর
(ঐ)

রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতায় নারী শরীরকে এড়িয়ে যাননি। শরীর চেতনায় তীব্র আবেগের উচ্চারণ ও তাঁর কবিতায় রয়েছে। নারীর শরীরের বিবরণও তাঁর কবিতাতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতার নায়িকা শরীরি রক্তমাংসের বাস্তব নারী নয়। যথার্থ বাস্তব আবেষ্টনি সহযোগে রবীন্দ্রনাথ এইসব নারীদের মূর্ত করে তোলেননি। তাঁর নায়িকাদের তিনি করে তুলেছেন ভাবলোকবাসিনী, দেহাতীত। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় লক্ষ্য করেছেন 'দ্বিমুখিতা বা বহুমুখিতা', সেগুলির বিষয় মানবিক অর্থে প্রেম না ঐশ্বরিক অর্থে ভক্তি,[২] সে বিষয়ে তিনি মনস্থির করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক নায়িকার মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করেছেন কালিদাসীয় সাজসজ্জা ও প্রাচীন সৌগন্ধ্য। 'রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কবি, কিন্তু তিনি কালিদাসের কালেই জন্মেছেন'[৩]—অতুলচন্দ্রগুপ্তের এই মন্তব্য, রবীন্দ্রনাথের নায়িকাদের শরীরি সজ্জা বিষয়ে যথার্থ। কিন্তু নজরুল যখন এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য তুলে নেন তখন তার কাব্য প্রেরণার উৎস সম্পর্কে একটি নতুন অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে। স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাই নজরুল স্বতন্ত্র। 'দোলন চাঁপা' কাব্যে প্রেমের আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। এ কাজের প্রেম ও সৌন্দর্যের মূল অবস্থিত দেহ চেতনা ইন্দ্রিয়জ প্রেমের কামনায় কবিচিত্ত ব্যাকুল। এবং এই প্রেম ও সৌন্দর্য সৃষ্টিতে কবি অনিবার্যভাবে অবলম্বন করেছেন চিত্রকল্পের। যেমন—

১. এমনি তোমার পদ্মপায়ের আঘাত-সোহাগ দিয়ো দিয়ো
এই ব্যথিত বুকে আমার, ওগো নিঠুর পরান-প্রিয়।
(ব্যথা গরব, দোলন চাঁপা)

২. মুঠার মানিক ঠেলে পায়ে
এলেম তোমার কুটির ছায়ে
চরণ ছায়ে
ক্লান্তি আমার দাও মুছায়ে
দীপ ঢাকা অঞ্চলে।
(সমর্পণ, ঐ)

৩. নদীপারের দেশে থাকি এমনি তারও আঁখি পাখী
দিগ্‌বালিকার পুব কপোলে চাওয়ার পাখা হানে।
চাওয়ায় চাওয়ায় চুমোচুমি রোজ মোদের ঐখানে।।
(পুবের চাতক, ঐ)

Dhaka University Institutional Repository

৪. তব স্নিগ্ধ মদির পরশ মুছে নিতে পারে মোর
সব জ্বালা সব দগ্ধ ক্ষত।

(পূজারিনী, ঐ)

এই প্রেম কামনা কখনো মিলনের আকাঙ্ক্ষায় অধির কখনো বিরহ বেদনায় আবেগময়। শরীরি স্পর্শের অনুভূতি এখানে তাই ভিন্ন মাত্রা সৃষ্টি করে। 'পূজারিনী'তে আবেগের প্রাবল্য আছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় যে, এখানে প্রেম কোন অতীন্দ্রিয়া লোকের বস্তু নয়।'[৪] সমসাময়িক মোহিতলাল মজুমদারের কবিতায় স্পর্শনির্ভর দেহচেতনার প্রকাশ ঘটলেও অনেকাংশে শেষ পর্যন্ত তিনি দেহাতীত। যেমন—

আমি মদনের রচিনু দেউল-দেহের দেহলী পরে
পঞ্চবারের প্রিয় পাঁচফুল সাজাইনু থরে-থরে।
দুয়ারে প্রাণের পূর্ণ কুম্ভ
পল্লবে তার অধরি চুম্ব।
...
দেহেরি মাঝের দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত!

(স্মরগরল, ১৩৪৩)

'ছায়ানট' কাব্যে প্রেমচেতনার প্রকাশ স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহার 'দোলন চাঁপা' কাব্যের তুলনায় আরো তীব্র আবেগে কম্পিত এবং আরো বেশি দেহনির্ভর। যেমন—

১. পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাব হয়ে ফুটত গাল।
থলকমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও গাল ছুঁই।
বকুল শাখা ব্যাকুল হত, মলাত ভুঁই।

(চৈতী হাওয়া, ছায়ানট)

২. অঙ্গ আসে অলস হয়ে নেতিয়ে পড়া অলস ঘুমে,
স্বপন পারের বিদেশীনির হিম ছোঁওয়া যায় নয়ন চুমে

(শেষের গান, ঐ)

৩. তখন তুমি নাই বা প্রিয় নাই বা রলে কাছে।
জানব আমার এই সে দেহে এই সে দেহে গো
তোমার বাহুর বুকের শরম ছোওয়ার কাঁপন লেগে আছে

(পরশ-পূজা, ঐ)

৪. যেমন ছাঁটি পানের কচি পাতা প্রজাপতির ডানায় ছোঁয়ায়,
ঠোঁট দুটি তার কাঁপন-আকুল একটি চুমায় অমনি নোয়ায়।।

(মানস-বধূ, ঐ)

৫. যার শীতল হাতের পুলক ছোঁয়ায়
কদম কলি শিউরে' ওঠে,
যুঁই কুড়ি সব নেতিয়ে পড়ে

Dhaka University Institutional Repository

কেয়া বধূর ঘোমটা টুটে।

(স্তব্ধ বাদল, ছায়ানট)

নজরুল ইসলাম প্রকৃতির বিচিত্র উপাদান এনে যেমন সাজিয়েছেন তাঁর মানস-প্রিয়াকে, তেমনি আবার প্রেমিকাকে রূপান্তরিত করেছেন প্রকৃতির কোমলতা, স্নিগ্ধতার অনিবার্য উপমান উৎসে। উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যক উদাহরণই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম উদ্ধৃতিতে বিচিত্র ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত কবি প্রিয়ার গাল স্পর্শের মাধ্যমে বিকশিত রূপের সে অসাধারণ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা অপূর্ব। চুম্বনের মতো আবেগময় স্পর্শে দৃষ্টি আনত করা এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে শরীরি সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনা—যা বাস্তবতা অতিক্রম করে দান করেছে চিত্রকল্পের অপূর্বত্ব। শরীরি স্পর্শের দ্বারা উষ্ণতা, শীতলতা, তন্দ্রা, বিকশতা, লজ্জা অথবা কম্পিত হওয়ার সে ইন্দ্রিয়ঘন আবেগ সৃষ্টি হয়েছে তা আশ্চর্যজনকভাবে চিত্রকল্পের গুণাবলি সমৃদ্ধ যা স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রসারণে পেয়েছে অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের 'সিন্ধু' কবিতায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের অসাধারণ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এ কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে কবি হৃদয়ের সে অদৃশ্য গোপন বেদনার হাহাকার ফেনিয়ে উঠেছে স্পর্শনির্ভর চিত্রকল্পগুলি যেন তারই প্রতিরূপ। প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার তীব্র আবেগে মথিত। যেমন—

চাঁদের কলঙ্ক ঐ, ওকি তব ক্ষুধাতুর চুম্বনের দাগ?

(সিন্ধু, প্রথম তরঙ্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

সুদূরের চাঁদ কবির প্রেয়সি, সিন্ধুরূপ ক্ষুধাতুর কবির হৃদয়ে অদৃশ্য চুম্বনের আকর্ষণে কবিকে করে দিশেহারা। নজরুলের এই চিত্রকল্পের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের একটি চিত্রকল্পের রয়েছে অসাধারণ মিল।

কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
ঢালিতেছে আলো—
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধাঁরালো
চুম্বনের মত।

চুম্বনজনিত স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর আরো চিত্রকল্পের সন্ধান এ কাব্যে পাওয়া যায়। চুম্বনের ফলে কখনো জেগে উঠেছে শরীরি চেতনার তীব্র আবেগ, কখনো তা কামনা মদির, কখনো বিরহ বেদনায় আচ্ছন্ন। যেমন—

১. তুমি গেলে করিতে চুম্বন, সে ফিরালো কঙ্কনের যায়
-গেল চলে নারী।

(সিন্ধু, দ্বিতীয় তরঙ্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

২. সে সবার মাকে যেন তর হরসন
অনুভব করিয়াছি!—ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে। ...
তোমারে যে করেছি চুম্বন

(অ-নামিকা, সিন্ধু-হিন্দোল)

৩. হাসিয়া উঠিল আলোকে আকাশ, নত হয়ে এল পুলকে
লতা-পাতা-ফুলে বাঁধিয়া আকাশে ধরা কয়, সই, ভুলোকে
বাঁধা পলে আজ, চেটে ধরে বুকে লজ্জায় ওঠে কাঁপিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

চুমিল আকাশ নত হয়ে মুখে ধরণীরে বুকে কাঁপিয়া।
(রাখিবন্ধন, সিন্ধু-হিন্দোল)

২. অতন্দ্র নয়নে তব লেগেছিল চুম
ঝর-ঝর কামিনীর এল চোখে ঘুম
রাত্রিময়ী রহস্যের;
(গোকুল নাগ, সর্বহারা)

৩. তোর বন্ধুর আঙুলের ছোঁওয়া এমনি কি যাদু জানে,
আবেশে গলিয়া অধর তুলিয়া ধরিলি অধরপানে।
একটি চুমায় মিটে গেল তোর সব সাধ সব তৃষা,
ছিন্ন লতার মতন মুরছি পড়িলি হারায়ে দিশা!
(মিলন-মোহনায়, চক্রবাক)

চুম্বনের এই তীব্র মদির কোমল আবেগময় স্পর্শের মধ্যে কখনো প্রাধান্য পেয়েছে একান্তই শরীরি চেতনা কখনো প্রাধান্য পেয়েছে প্রকৃতির রূপকে কবিচিত্তের প্রেম কামনা। এছাড়াও নজরুলের কাব্যে স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর একাধিক চিত্রকল্পের সন্ধান নজরুলের কাব্যে পাওয়া যায়। যেমন—

১. হে সুন্দর! জল-বাহু দিয়া
ধরণীর কাটতট আছ আঁকড়িয়া
ইন্দ্রনীল কান্তমনি মেঘলার সম,
(সিন্ধু, তৃতীয় তরঙ্গ, সিন্ধু হিন্দোল)

২. এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে।
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পুবের হাওয়ার কাঁপন লাগে।
(পলের স্মৃতি, সিন্ধু হিন্দোল)

৩. পাশে কাম যাতনায় কাঁপে মালতী বেলি!
ঝুরে আলু থালু কামিনী
জেগে সারা যামিনী,
মল্লিকা ভামিনী
অভিমানে ভার,
কলি না ছুঁতেই ফেটে পড়ে, কাঁটালি চাঁপার।
(মাধবী-প্রলাপ, সিন্ধু-হিন্দোল)

৪. আমি জানি তুমি কেন কহ না ক'কথা।
সে দিনো তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াত না লতা
(ভীরু, জিঞ্জীর)

৫. আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরনা,
ব্যথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
(ভীরু, জিঞ্জীর)

৬. মোরা শুধু জানি
তব পায়ে কেঁদেছিল সারা পলখানি।

Dhaka University Institutional Repository

সেধেছিল, এঁকেছিল ধূলি-তুলি দিয়া
তোমার পদাঙ্ক-স্মৃতি।

(গোকুলনাগ, সর্বহারা)

৭. কমল-দীঘিতে কমল-মুখীরা অধরে হিঙ্গুল মাখে,
আলুথালু বেশ-ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ আঁচল ঢাকে।

(বাতল রাতের পাখি, চক্রবাক)

৮. জাগিয়া একাকী জ্বালা করে আঁখি আসিত যখন জল,
তোমাদের পাতা মনে হত যেন সুশীতল করতল

...

তোমার পাখার হাওয়ায়
তারি অঙ্গুলি পরশের মত নিবিড় আদর- ছাওয়া।

(বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি, চক্রবাক)

৯. ও মুখ কমল
উঠেছিল রাস্তা হয়ে, পদ্মের কেশর
ছুঁইলে দখিনা বায়, কাঁপে, থরথর—
যেমন কমল দল ভঙ্গুর মৃণালে
সলাজ সঙ্কোচে সুখে পল্লব-আড়ালে,

(তুমি মোরে ভুলিয়াছ, চক্রবাক)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি ব্যতীত স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর আরো প্রচুর উদাহরণ সংগ্রহ সম্ভব। এক্ষেত্রে বলা চলে নজরুল ইসলাম স্পর্শেন্দ্রিয়নির্ভর ত্বক বা শরীরি চেতনার বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে কখনো ব্যবহার করেছেন রক্তমাংসের আবেগে প্রাণিত মানুষের ইন্দ্রিয় উপস্থিতি। অপরদিকে এই চিত্রকল্পসমূহ বিদ্রোহের উত্তেজনাকে ধারণ করেছে যেমন, তেমনি এই চিত্রকল্প কবিচিত্তের প্রেম-আবেগ, প্রেমের অপ্রাপ্তিজনিত যন্ত্রণার স্পর্শে বিকশিত। এই বিচিত্র চেতনার প্রকাশে নজরুল স্পর্শনির্ভর চিত্রকল্প সৃষ্টিতে সার্থক ও বৈচিত্র্যসন্ধানী।

তথ্যসূত্র

১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *নজরুল ইসলাম কবি ও কবিতা*, নজরুল একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭, পৃ. ২৬৬।
২. বুদ্ধদেব বসু, *কবি রবীন্দ্রনাথ*, প্রথম দে'জ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ২৫।
৩. অতুলচন্দ্রগুপ্ত, *রবীন্দ্রনাথ ও সংস্কৃত সাহিত্য*, জয়ন্তী উৎসর্গ, বিশ্বভারতী, পৌষ, ১৩৩৮, পৃ. ২৫।
৪. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি নজরুল*।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্যে মিশ্র বাক্‌প্রতিমা

একটি শব্দই যেখানে কবি চেতনার কৌলসংকেত, একটি শব্দেই যেহেতু উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে কবির কল্পনা-প্রতিভার যাবতীয় বৈচিত্র্য এবং কবি ঐ শব্দের আশ্রয়ের প্রকাশ করেন বস্তু ও অনুভূতির বিচিত্র ধর্ম। এই প্রকাশ অবশ্যই ইন্দ্রয়ানুভবের আশ্রয়ে জর্জরিত। এবং তা সর্বত্র একক কোনো ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়। মূলত বস্তুই ব্যক্তির সকল ইন্দ্রিয় সম্প্রসারিত ও সংকুচিত করে। প্রথমত দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও বস্তু ব্যক্তির অপরাপর ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করে তোলে। ফলে অনেকাংশে এই দৃশ্যনির্ভরতা মূলত একটি যৌথ বিষয়, একটি মিশ্র প্রক্রিয়া।

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় বাক্‌প্রতিমার বিচিত্রগামিতার পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁর কবিতায় বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টিতে পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় নির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংমিশ্রণে চিত্রকল্প রচনার পরিচয় মেলে। কখনও দুটি কখনও দুয়ের অধিক ইন্দ্রিয়জ আবেগকে নজরুল একই সঙ্গে চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করেছেন। ফলে চিত্রকল্পগুলি একটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। একাধিক ইন্দ্রিয়জ আবেগের সমন্বয়ে চিত্রকল্প সৃষ্টির ফলে তাঁর কবিতার বক্তব্য একদিকে যেমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে অপরদিকে তেমনি শিল্পবিচারেও নজরুলের অসামান্য প্রতিভার নির্দেশনকে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। মিশ্র চিত্রকল্প সৃষ্টিতে নজরুলের সাফল্যের কতিপয় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হলো।

১. বজ্র শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

২. ঐ যে মহাকাল সারথি রক্ত তড়িৎ চাবুক হানে
রনিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন ব্রজগানে ঝড়-তুফানে।
ক্ষুরের দাপট তারার লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে।
(প্রলয়োল্লাস, অগ্নিবীণা)

৩. আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে একে দিই পদ চিহ্ন;
(বিদ্রোহী, অগ্নিবীণা)

৪. রক্তাম্বর পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন;
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝন-ঝন
সিথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো
জ্বল সেথা জ্বাল কাল চিতা
(রক্তাম্বর দারিনী মা, অগ্নিবীণা)

মিশ্র বাক্‌প্রতিমা নির্মাণের চমৎকার সাজুয্য সৃষ্টি হয়েছে নজরুলের কাব্য রচনার প্রথমাবধিই। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত কবিতা 'প্রলয়োল্লাস' ঝড় বিশেষত কালবৈশাখীর ঝড় নজরুলের অত্যন্ত প্রিয় প্রতীক, নজরুলের নিজের পরিচয়কে স্পষ্ট করে তোলার জন্য বারবার ঝড়ের প্রতীককে ব্যবহার করেছেন, ঝড় বা কালবৈশাখী নজরুলে নিছক প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনার জন্যে ব্যবহৃত হয়নি বরং সংঘাত, সংগ্রাম, পরিবর্তন, পুরাতনের বিলোপ এবং নতুনের আবাহনের রূপক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। কালবৈশাখীর ঝড়

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের নতুনের কেতনের চিত্রকল্প, তিনি যার জয়ধ্বনি করার আহ্বান জানিয়েছেন কবিতাটির প্রতিটি স্তবকে। ঝড়ের চিত্রকল্পে ভয়ঙ্করের আগমনকে এ কবিতায় প্রত্যক্ষ করা হয়েছে, প্রলয়-নেশার নৃত্যপাগল যে ভয়ঙ্কর মুক্তি সিন্ধুপারের সিংহদ্বারের আগলকে ধমক হেনে ভেঙে দিল মৃত্যুগহন অন্ধকূপে মহাকালের চণ্ডরূপে ব্রজশিখার মশাল জ্বেলে ধুম্র ধূপে সে ভয়ঙ্করের চিত্রকল্প নজরুল অঙ্কন করেছেন তা বাহ্যত প্রকৃতির রুদ্ররূপের প্রতিমূর্তি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবেরই চিত্রকল্প।[১] প্রথম উদ্ধৃতিটিতে ব্রজশিখার দ্বারা প্রজ্জ্বলিত মশালের দৃশ্যময়তার সঙ্গে হাস্যধ্বনির মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে অসাধারণ একটি চিত্রকল্প। দৃশ্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের এই সমন্বয়কে নজরুল শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছেন

'প্রলয়োল্লাস' কবিতা থেকে গৃহীত উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিতে "ঝড়ের ভয়ঙ্কর ও প্রলয়ঙ্কর রূপের এক বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করি। ঝড়, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুতাহত অসীম আকাশকে তীব্রগতিসম্পন্ন অশ্বরূপে কল্পনা করে সৃষ্ট হয়েছে অভিনব চিত্রকল্পটি।"[২] রক্তের রূপকাশ্রয়ী বিদ্যুতের চাবুকের আঘাতে অশ্বের তীব্রগতিসম্পন্ন ঝড় এবং সেই অশ্বের ক্ষুরের আঘাতে নক্ষত্র ছিটকে ঝরেপড়ার অসাধারণ দৃশ্যের সঙ্গে অশ্বের চিৎকার ক্রন্দনের ধ্বনির মিশেলে সৃষ্ট মিশ্র চিত্রকল্পটি তুলনারহিত।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহের তৃতীয় এবং শেষটিতে নজরুল ইসলাম পুরান প্রসঙ্গ এনে কবিমানসের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তৃতীয় উদাহরণে বিদ্রোহী শিবের ধ্বংসাত্মক মূর্তির দৃশ্যময়তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে পদচিহ্ন এঁকে দেবার স্পর্শের অনুভূতি। শেষটিতে দুর্গার ধ্বংস সৃষ্টির যৌথসত্তার রূপকল্পে অনিবার্যভাবে মিশ্র চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন। 'শ্বেত-বসন', 'সিথির সিঁদুর', 'কাল-চিতা' ইত্যাদি শব্দবন্ধ দুর্গার রূপ ও পরিস্থিতিকে দৃশ্যমান করে তোলে। এই দৃশ্যময়তার সঙ্গে তরবারির ধাতব শব্দের সংযোজনে দৃশ্যেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের চমৎকার সমন্বয় লক্ষণীয়। মরণ-বরণ কবিতায় নজরুল ইসলাম আশ্চর্যভাবে বিবিধ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেছেন একই সঙ্গে। যেমন—

দীপক রাগে বাজাও জীব-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি।
কাঁধে পিঠে কাঁদে সেথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ।
(মরণ-বরণ, বিষের বাঁশি)

'মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'—অসাধারণ কবি প্রতিভার স্ফূরণে নজরুল ইসলাম এখানে মৃতের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন, যা আগুনের প্রতিরূপ। বস্তুর মধ্যে নির্বস্তুক উপলব্ধির সঞ্চারে নজরুল এখানে দৃশ্যের সঙ্গে শ্রুতিকে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং একই সঙ্গে জুতোয় ছাপ দেওয়ায় স্পর্শইন্দ্রিয়ের প্রয়োগে এখানে একটি মিশ্র বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টি হয়েছে।

'ছায়ানট' কাব্যের একাধিক কবিতায় পাওয়া যায় বিবিধ ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ মিশ্র চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত। যেমন—

১. মোর বেদনার কর্পূর বাস ভরপুর আজ দিগ্বলয়ে
বনের আঁধার লুটিয়ে কাঁদে হরিণটি তার হারায় ভয়ে
(শেষের গান, ছায়ানট)

২. পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই
মধুপ দেখে যাদের শাখা-আপনি যেত নুই।
হাসতে তুমি দুলিয়ে ভাল,
গোলাব হয়ে ফুটত গাল।
থলকমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও গাল ছুঁই।

Dhaka University Institutional Repository

বকুল শাখা ব্যাকুল হত, টলমলাত ভুঁই।
(চৈতী হাওয়া, ছায়ানট)

৩. উদাস দুপুর কখন গেছে, এখন বিকাল যায়
ঘুম জড়াল ঘুমতী নদীর ঘুমুর-পরা পায়।
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউ এর শাখায় ... আঁধার কে পিঁজেছে, হায়।
মাঠের বাঁশী বন উদাসী ভীম পলাশী গায়।
(চৈতী হাওয়া, ঐ)

৪. বুকের কাঁপন হুঁতাশ-ভরা, বাহুর বাঁধন কাদন মাখা
নিটোল বুকের কাঁচল আঁচল স্বপনপারের পরীর পাখা
খেয়াপারের ভেসে আসা
গীতির মত পায়ের ভাসা,
চরণ-চুমায় শিউরে পুলক হিম-ভেজা দুধ-ঘাসের বোঁয়ায়।
(মানস-বধূ ঐ)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে নজরুলের চিত্রকল্প সৃষ্টিতে বিচিত্র অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটিতে ঘ্রাণ এবং শ্রুতিনির্ভর ইন্দ্রিয়ের প্রয়োগ লক্ষণীয়। দ্বিতীয়টিতে দৃশ্যেন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয় তৃতীয় সংখ্যক উদাহরণে শ্রুতি ও স্পর্শেন্দ্রিয়, চতুর্থ সংখ্যক উদাহরণে দৃশ্য, শ্রুতি ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে চিত্রকল্পগুলিতে সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা।

'দারিদ্র্য' কবিতায় রয়েছে মিশ্র চিত্রকল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কবির সকল আশা আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে নির্মম দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে। বৃন্তচ্যুত শেফালিকা ফুলের ঝরে পড়াকে কবি বিধবার হাসির সঙ্গে তুলনা করেছেন একটি চিত্রকল্পে। বিধবার হাসির করুণা, যন্ত্রণা এবং রিক্ততার উপমানচিত্রে শিউলি। ফুলের ঝরে পড়ার গতিময়তা দৃশ্যময় হয়েছে এই চিত্রকল্পটিতে—

ম্লান শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি,
বিধবার হাসি সম-স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি।
(দারিদ্র্য, সিন্ধু-হিন্দোল)

এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে উপলব্ধির গভীরতাজাত সাদৃশ্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে কল্পনা প্রসারী বৈশিষ্ট্য এবং দৃশ্যচিত্রের সঙ্গে ঘ্রাণচেতনা যুক্ত হয়ে চিত্রকল্পটিতে সঞ্চার করেছে অপূর্ব ব্যঞ্জনা।

'চক্রবাক' নজরুলের কবি প্রতিভার সংহত প্রকাশ। প্রেমের চিত্রময়, সংহত এবং শিল্পিত প্রকাশে চক্রবাক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও নজরুল এ কাব্যে অনেকাংশে প্রজ্ঞাশাসিত। এ কাব্যে প্রকৃতি নজরুলের কবি প্রতিভার স্পর্শে হয়েছে সংযত। শিরোনামহীন একটি কবিতায় কবির হৃদয়ের শূন্যতা এবং বেদনার প্রকাশ ঘটেছে চমৎকার একটি মিশ্র চিত্রকল্পে—

অসীম আকাশ আসে মোর পাশ তারার দীপালি জ্বালি,
বলে, পরবাসী। কোথা কাঁদ আসি? হেথা শুধু চোরাবালি
তোমার কাঁদনে আমার ... নিভে যায় তারা-বাতি
তুমিও শূন্য আমিও শূন্য, এস মোরা হব সাথী।
(শিরোনামহীন কবিতা, চক্রবাক)

Dhaka University Institutional Repository

সীমাহীন আকাশে তারার দীপালি জ্বালায় দৃশ্যচিত্রের সঙ্গে প্রেমিকার ক্রন্দন ধ্বনির শ্রুতিচেতনার সমন্বয় চমৎকারভাবে গ্রথিত হয়েছে।

নজরুলের কবিতাবলী হতে আরো উদাহরণ সংগ্রহ করা দুরূহ নয়। কাব্যচর্চার সূচনাকাল থেকেই নজরুল কবিতার শরীরে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেছেন প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। মিশ্র চিত্রকল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বরং এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ধর্মে চিত্রকল্প সৃষ্টির স্বভাবগুণই তাঁর কবিতাকে পৃথক মাত্রা এনে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. রফিকুল ইসলাম : *নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার*, সাহিত্য পত্রিকা, অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০, ১১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম কবি তাঁর কবি প্রতিভা স্বভাবগতভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অর্থাৎ তাঁর কাব্যচর্চার পেছনে রয়েছে একটি অনায়াসলব্ধ ধারা, একটি সহজ-সরল গতি। অথচ এই অনায়াস প্রচেষ্টা বা সহজ-সরল কাব্য ধারার সৌন্দর্য সৃজনে নজরুলকে মনে হয় অনেকাংশে সচেতন। বিশেষত কবিতার বিষয় এবং ভাব প্রকাশের জন্য গৃহীত শব্দাবলির একটি চমৎকার সমন্বয় যেমন লক্ষণীয়, তেমনি অলংকার ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও এক অসামান্য প্রতিভার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যদিও কখনও কখনও তাঁর কবিতা আবেগ বাহুল্যে ভারাক্রান্ত, কিন্তু কবিতা তো আবেগেরই বিচিত্র শব্দরূপ।

প্রথমাবধিই নজরুল তাঁর কবিতার এই আবেগকে কখনও সংহত করেছেন, কখনও প্রকাশ করেছেন আবেগের বাধাবন্ধনহীন গতিরূপ। 'অগ্নিবীণা' থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত নজরুল কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে শব্দ ব্যবহার ও চিত্রকল্প সৃষ্টিতে ঐ আবেগ প্রকাশ করেছেন। ফলে তাঁর কবিতায় সৃষ্টি হয়েছে অপূর্ব সব চিত্রকল্প। তাঁর বিদ্রোহী মানসিকতা অথবা সাম্যবাদ প্রচারার্থে অথবা প্রেমের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বময় যে সৌন্দর্য চেতনার বহিঃপ্রকাশ কবিতাবলীর মধ্যে লক্ষণীয়, সেখানে সবক্ষেত্রে নজরুলের সে চেতনাগত মৌলসত্য লভ্যযোগ্য তা হলো তাঁর রোমান্টিক মানস প্রবণতা। এই রোমান্টিক মানস প্রবণতার মাধ্যমেই নজরুল চেয়েছেন নিপীড়িত, শোষিত পদানত মানবাত্মা ও সমাজের মুক্তি। অপরদিকে চেয়েছেন ব্যক্তিবোধের অহংচেতনার মুক্তি এবং প্রেমের ব্যর্থতাজনিত বেদনার পরিসমাপ্তি। এই জন্যই তাঁর বিদ্রোহ এবং প্রেম পরস্পর পরিপূরক। কবিতায় বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টি তাঁর এই দ্বৈতসত্তার সমন্বিত রূপকে দান করেছে পরিণতি।

যদিও নজরুলের সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কিত উচ্চকণ্ঠের কবিতাগুলিতে অনেকাংশে শিল্পসৌন্দর্য রক্ষিত হয়নি বলে সমালোচিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে কবিতাগুলি সৃষ্টির পশ্চাতে রয়েছে কবি মনের প্রেরণা ও দরদ। বক্তব্য প্রধান কবিতাগুলি শিল্পবিবর্জিত হলেও অন্তপ্রেরণার জন্য একটি সহজ সরল প্রসাদগুণে সমৃদ্ধ। শিল্পের পরিমিত বোধ সম্পর্কে অসচেতন—একথা সত্য স্বীকার করেই বলা যায় নজরুল শিল্পী স্বভাবের সূক্ষ্ম অনুভূতি কোমল স্নিগ্ধ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশের চাইতে তিনি আশ্রয় খুঁজেছেন নিজস্ব হৃদয়ের তাগিদ আজন্ম তারুণ্যের চঞ্চলতা বিকিরণকারী বিচিত্র শব্দরাশির মাধ্যমে। একারণেই ভারতীয় এবং বিশ্বপুরাণের বিভিন্ন চরিত্র এবং ঘটনা তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। সমকালীন সমাজ রাজনীতি দেশ জাতির কল্যাণ, পরাধীনতা থেকে মুক্তির চিন্তা সবই তিনি কামনা করেছেন। একটি পৌরাণিক জগতের চমৎকার পরিমণ্ডল তৈরি করে। আবার অপরদিকে তিনি তুলে এনেছেন প্রকৃতির বিভিন্ন উপরকণ। কিন্তু পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক এই উপকরণমালা সমকালীন রবীন্দ্রনাথ অথবা অন্যান্য কবিদের তুলনায় পৃথক। পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক এই উপকরণমালা তাঁর কবি স্বভাবের স্বতঃস্ফূর্ততার গুণে সৃষ্টি করেছে নিজস্ব স্বতন্ত্র একটি কাব্যভূবণ। বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই উপকরণ রাশির ব্যবহার এবং কবি ধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশ প্রবণতায় বেশি লক্ষণীয়। বরং বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টিতে নজরুলের রয়েছে অপরিমিত আগ্রহ। যদিও শিল্পতাত্ত্বিকভাবে ঐ চিত্রকল্পরাশি সুসংহত নয়, কিন্তু অসাধারণ এবং নিজস্ব ভঙ্গির চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত নজরুলের কাব্যসমগ্রে প্রচুর। এবং সেগুলিতে নজরুল প্রতিভার বিকাশ আশ্চর্যজনকভাবে শিল্পিত।

বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে নজরুল ইসলামের স্বাতন্ত্র্য এবং সাফল্যের পরিচয় পৃথক পৃথক অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। নজরুল কাব্য সৃষ্টিতে যে বিচিত্রমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর দৃষ্টান্ত তাঁর ব্যবহৃত চিত্রকল্প। রূপ, রস, ঘ্রাণ স্পর্শ ইত্যাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়ের সার্থক প্রয়োগের পাশাপাশি নজরুল একাধিক ইন্দ্রিয়কে একই সঙ্গে সমন্বিত করেছেন। ফলে চিত্রকল্পে সৃষ্টি হয়েছে একটি মিশ্র আবহ। নজরুলের বিদ্রোহ এবং

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম এই উভয় প্রবণতার কাব্যিক প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর দুইটি ধারা লক্ষণীয়। বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশে তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক লৌকিক উপাদান অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। প্রেমের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে নজরুল বৃক্ষ-পুষ্প মেঘ বাতাস বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপকরণ রাশির সঙ্গে আঙুর, মদ ,বাঁশি এবং রক্তমাংসের শরীর এত চমৎকার কৌশলে সমন্বিত করেছেন যে প্রতিটি চিত্রকল্প স্বতন্ত্র একটি গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া বাংলা, সংস্কৃত, লোকজ, ফারসি, পৌরাণিক ইত্যাদি শব্দ গ্রন্থনার যে কৌশল তা একান্তই নজরুলীয় সমকালীন বা পরবর্তী বাংলা কাব্যধারায় তা স্বীকৃত এবং অভিনব। নজরুল ইসলাম কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে কেবল যে বিষয়ের প্রতিই গুরুত্ব দিয়েছেন তা নয়, প্রকরণ শৈলীর প্রতিও ছিল তার সজাগ দৃষ্টি—চিত্রকল্প সৃষ্টিতে তার সেই সজাগতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজী নজরুল ইসলাম এই বিচারে অবশ্যই বাংলা কবিতার ভূবনে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

নজরুল মূলত চিত্রকল্পের কবি, নজরুলের কবিতায় বিমূর্ত ও অতিন্দ্রিয় আবেগ অনুভূতি চিত্রকল্পের মাধ্যমে মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বীয় আবেগ ও অনুভূতি মূর্ত থেকে বিমূর্ত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। নজরুলের কবিতায় তার বিপরীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আবেগ সীমা থেকে অসীমের পথে ধাবিত আর নজরুলের অসীম থেকে সীমার দিকে। নজরুলের চিত্রকল্পগুলিতে পঞ্চইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেগের মূর্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় কারণ নজরুল ছিলেন সেই শ্রেণীর কবি যিনি মাটির কাছাকাছি।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল কাব্য

১. *অগ্নিবীণা*, আর্য পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা ১৯২২।
২. *বিষের বাঁশী*, কল্লোল পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।
৩. *ভাঙার গান*, ডিম.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯২৪।
৪. *সাম্যবাদী*, বেঙ্গল পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা ১৯২৫
৫. *সর্বহারা*, বর্মন পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা ১৯২৬।
৬. *ফণিমনসা*, কলকাতা ১৯২৭।
৭. *বাঁধনহারা*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯২৭।
৮. *সন্ধ্যা*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯২৯।
৯. *প্রলয় শিখা*, কলকাতা ১৯৩০।
১০. *দোলন চাঁপা*, কলকাতা ১৯২৩।
১১. *ছায়ানট*, বর্মণ পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।
১২. *পূবের হাওয়া*, কলকাতা ১৯২৬।
১৩. *সিন্ধু হিন্দোল*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯২৮।
১৪. *জিঞ্জীর*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯২৯।
১৫. *চক্রবাক*, ডি.এম. লাইব্রেরি, কলকাতা ১৯২৯।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *বিচিত্র প্রবন্ধ*, কলকাতা।
২. বুদ্ধদেব বসু : *সমালোচনার পরিভাষা*, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৫৫।
৩. আবু সায়ীদ আইয়ুব : *পথের শেষ কোথায়*, ২য় সংস্করণ ১৯৮০।
৪. ড. শ্যামল কুমার ঘোষ : *কবিতার চিত্রকল্প*, কলকাতা ১৩৯৪।
৫. সিদ্দিকা মাহমুদা : *রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা : চেতনা ও চিত্রকল্প*, মুক্তধারা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮১।
৬. রফিকুল ইসলাম : *নজরুল ইসলাম : জীবন ও কবিতা*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা ১৯৮২।
৭. রফিকুল ইসলাম : *নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*, কে.পি. বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৯২।
৮. মোঃ মাহফুজউল্লাহ : *নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ*, নজরুল একাডেমী, ১৩৮০।
৯. দীপ্তি ত্রিপাঠী : *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, ২য় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৮৪, নভেম্বর ১৯৭৭।
১০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : *নজরুল ইসলাম কবিমানস ও কবিতা*, চতুর্থ সংস্করণ, কার্তিক ১৪০৫, নভেম্বর ১৯৯৮।
১১. বিশ্বজিৎ ঘোষ : *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩।
১২. আবদুল মান্নান সৈয়দ : *নজরুল ইসলাম : কবি ও কবিতা*, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, আগস্ট ১৯৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. সৈয়দ আকরাম হোসেন : *নজরুলের নটরাজ : বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫।
১৪. বুদ্ধদেব বসু (সম্পাদিত) : *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ*, কলকাতা ১৯৮৪।
১৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পাদিত) : *নজরুল সমীক্ষণ* (চিত্রকল্পের সম্রাট), নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১৯৯৯।
১৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পাদিত) : *মোহিতলাল মজুমদারের নির্বাচিত কবিতা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯।
১৭. Cecil Day Lewis, *The Poetic Image*, Ibid, P. 24.

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. রফিকুল ইসলাম : *নজরুলের প্রথম পর্বের কাব্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার*, সাহিত্য পত্রিকা (সম্পাদক নীলিমা ইব্রাহীম), অষ্টাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৮১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০, ১১।
২. নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, *জন্ম শতবর্ষ* সংখ্যা।